শরণ-গ্রহনের পরম্পরা

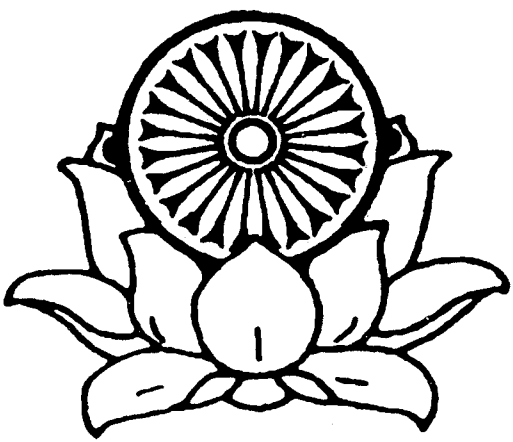

অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল

সম্যক্ প্রকাশন
নতুন দিল্লী- ৬৩
২০০৪

গ্রন্থ শীর্ষক : *শরণ-গ্রহণের পরম্পরা*

গ্রন্থকার : অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল

প্রকাশকাল : ২৬/১১/২০০৪ কার্ত্তিক পূর্ণিমা

সংস্করণ : প্রথম ১০০০ কপি

কম্পোজিং ও ডিজাইনিং : শ্রী সরিৎ রঞ্জন বড়ুয়া,

কপিরাইট : গ্রন্থকার (সর্বাধিকার)

মুদ্রক : গৌতম প্রিন্টর্স, ৩০০/২,
পশ্চিমপুরী, নতুন দিল্লী - ৬৩

অস্থায়ী বাসস্থান (গ্রন্থকারের) : 5/1, (Staff Flats), University Road,
University of Delhi , Delhi- !10007 (India)
Tel: 011-27667003
email: bhsatyapalam@yahoo.com
buddhatriratnamission@yahoo.com

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

অভিমত

ত্রিশরণ হলো বুদ্ধ-শাসনের প্রবেশদ্বার। যে বা যাঁরা বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ- এ ত্রিশরণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাঁরাই বৌদ্ধ নামে পরিচিতি লাভ করেন। ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত থেকেই প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথে এগিয়ে যেতে হয়। ইহা ব্যতিত অন্য কোন বিকল্প মার্গ নেই। অতএব দুঃখমুক্তিকামী প্রত্যেক বৌদ্ধের ত্রিশরণ সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই পঞ্চশীল পালন করে থাকেন।

আয়ুষ্মান অধ্যাপক ডঃ সত্যপাল মহাথের প্রণীত যে *"শরণ-গ্রহণের পরম্পরা"* পুস্তিকাটির পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি অতীব আনন্দিত হয়েছি, কারণ এ পুস্তিকার মাধ্যমে প্রত্যেকের ত্রিশরণ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন। গ্রন্থকার মহোদয় ত্রিপিটক ও ইহার অর্থকথা, টীকা, অনুটীকা এবং নানা পালি সাহিত্যকে মন্থন করে যেভাবে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন আমার দৃষ্টিতে বাংলা-ভাষায় ইহা একটি অভিনব সংযোজন। এতে গ্রন্থকারের পালি সাহিত্যে গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার ইতিপূর্বেও কয়েকখানি গ্রন্থ উপহার দিয়ে পণ্ডিত সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ পুস্তিকাটিও অনুরূপভাবে সমাদৃত হওয়ার দাবী রাখে।

আমি গ্রন্থকারকে যে ভাবে কাছে থেকে দেখেছি তিনি একজন অধ্যাবসায়ী, সুলেখক, সুদেশক, একজন সুশিক্ষিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। সে কারণে তিনি ইতিমধ্যেই অনেক গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। আমি তাঁর আরও উত্তরোত্তর গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য কামনা করছি। এর সাথে সাথে এ গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ ত্রিশরণ-মার্গের প্রকৃত সন্ধান লাভ করুক কামনা করি।

ইতি
শুভার্থী
রাষ্ট্রপাল মহাথের
সভাপতি ও বিদর্শনাচার্য,
আন্তর্জাতিক সাধনা-কেন্দ্র, বুদ্ধগয়া
তারিখ:০৩/১১/২০০৪

"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স"

-ঃ ভূমিকা ঃ-

ঠিক কোন্ দিন কোন্ তিথিতে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণের পরম্পরার সাথে আমি যুক্ত হই তা বলা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পেছন পানে তাকিয়ে ফেলে আসা দিনগুলোতে স্মৃতির গলি বেয়ে তলিয়ে সঠিক দিন-ক্ষণ জানার চেষ্টা বিফলে যায়। তবে যে কথাটি ভেবে পেলাম আর স্মৃতির মণি-কোঠায় আজও যা উজ্জ্বল হয়ে আছে সেটা হল- বাল্যাবস্থায় জ্ঞানোদয় হবার পর হতেই প্রায়ই সকাল-সন্ধ্যায় বন্দনাকালে মায়ের আঁচল ধরে পাশে বসে তুতলিয়ে তুতলিয়ে ত্রিরত্ন-বন্দনা ও ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতাম। ঐ হতেই এ কর্ম আমার অন্তরে সংস্কারাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধু আমার জীবনে নয়, আমাদের পরিবারের ভাইবোনদের প্রত্যেকের বেলাতেও তা সত্য। এ আমাদের পরিবারের একটি পরম্পরা। আশা করি অন্য বৌদ্ধ পরিবারের বেলাতেও তা সত্য হবে।

যে কোন প্রশংসনীয় পরম্পরায় আবদ্ধ থাকাটা প্রত্যেকেরই গর্বের বিষয়। প্রত্যেকের কর্তব্য এমন পুণ্যবর্দ্ধক পরম্পরাকে অক্ষুণ্ন রাখা। তবে আমি ঐ পরম্পরাকে অক্ষুণ্নভাবে অব্যাহত রাখতে পেরেছি বললে বোধ হয় অন্ত ত দুটি দৃষ্টিতে ভুল হবে। প্রথমত বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন মতে। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের মুলাধার হল ত্রিলক্ষণবাদ। এ ত্রিলক্ষণবাদের প্রথমটি হল- অনিত্যবাদ। এ অনিত্যবাদমতে দৃশ্য-অদৃশ্য অস্তিত্ববান সবই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল তত্ত্বের কোন দুই অবস্থা সমান হয় না বা হতে পারে না। দুই স্থিতির মধ্যে কিছু না কিছু ভেদ অবশ্যই থাকে। যে ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে বাল্যাবস্থায় ত্রিশরণ-গ্রহণ করতাম আর আজ নিয়ে থাকি- এ দু'য়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত ব্যবহারিক দৃষ্টিতে। বাল্যাবস্থায় ত্রিশরণ নিতাম মুখ্যত মাতৃতুষ্টিকরণার্থে। মার অনুকরণ করার দৃষ্টিতে। সত্য বলতে বুদ্ধভক্তি ছিল নগণ্য। বাহানা মাত্র। আর আজ যা করছি তাতে (ঐ শ্রদ্ধা-ভক্তিতে) মাতৃতুষ্টিকরণটা মুখ্য নয়, তা গৌণ। বাল্যকালের অঙ্কুরিত শ্রদ্ধা আজও প্রস্ফুটনের

প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এখানে বুদ্ধতুষ্টিও কোনপ্রকারে মুখ্য নয়। আত্মতুষ্টিই মুখ্য কারণ। আজকের বুদ্ধভক্তিতে রয়েছে বিগত ৫৪ বছরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রায় ৩৪ বছর ভিক্ষু-জীবনের ধর্মীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণের সাথে যুক্ত রয়েছে প্রায় ২৩ বছরের বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাজাত ভক্তি-শ্রদ্ধা। বাল্যাবস্থায় ত্রিশরণ গ্রহণ করতাম পরপ্রেরণায় (অর্থাৎ সসংস্কারিক চিত্তে)। আর আজ নিচ্ছি স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ অসংস্কারিক চিত্তে)। শুধু তা নয়। আজ আমার আস্থায় আস্থাবান হয়ে দেশবিদেশের অনেকে ত্রিশরণাগত হচ্ছেন। কাজেই নির্দ্বিধায় বলতে পারি- বাল্যাবস্থায় ত্রিশরণাগত হবার আর আজকের ত্রিশরণাগত হবার ভক্তি-শ্রদ্ধায় রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

বৌদ্ধ মাত্রই ত্রিশরণ গ্রহণ করে বটে, তবে কেন করে বা কেন করা উচিত তা বোধ হয় আজও তাদের অনেকেরই অজানা বা তারা জানতে আগ্রহী নয়। না জানার কারণে অন্যকে জানাবার বা বোঝাবার সাহস তাদের অন্তরে হয় না। পরালোচনা করা অপেক্ষা আত্ম-আলোচনা কষ্টকর, তবে তা হয় শ্রেয়স্কর। আমার নিজের কথাই এখানে বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয় প্রায় দু বছর পূর্বে। তখনও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও শাস্ত্রে ত্রিশরণ-গ্রহণের পৃষ্টভূমি সম্পর্কে আমার ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সত্যানুসন্ধানী হবার চেয়ে কোন কিছুর অন্ধানুকরণ করাটা অনেক সহজ। প্রসঙ্গ আসলেই স্থবির-মহাস্থবিরের কাছ হতে শোনা কথা তোতা-ময়নার মতো আওড়িয়ে বাহবা কুড়াতাম মাত্র।

মহামানব বুদ্ধ তাঁর জীবনে কোন ব্যাপারেই কোন কিছুরই অন্ধানুকরণ করেন নি। বরংচ অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার জনিত রীতিনীতির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। যা করেছেন যুক্তি-তর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তিনি করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্যানুশিষ্যসমূহকেও কোন ব্যাপারে অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন (***কালাম-সুত্ত***)। পরের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয়, নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (***পচ্চত্তং বেদিতব্বো***) একবার নয়, বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আহ্বান

জানান (*এহি পস্সিসকো*)। এরপর জীবন-মান উন্নয়নে সহায়ক ও পূরক বলে মনে হলে কোন কিছুকে অপ্রমত্ততার সাথে গ্রহণ বা অনুশীলন করার (*অপ্পমাদেন সম্পাদেথ*) পরামর্শ দেন। তা না হলে তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় শাস্তার প্রবর্তিত ত্রিশরণগ্রহণজনিত পরম্পরাকেও অন্ধবিশ্বাসের সাথে গ্রহণ না করে, খুঁতিয়ে দেখার আবশ্যকতা রয়েছে বৈকি। বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে ত্রিশরণ-গ্রহণ-জনিত পরম্পরার শুভারম্ভ, বিকাশ ও সম্বর্দ্ধন কিভাবে বর্ণিত হয়েছে তা সুখ, শান্তি ও সত্যান্বেষীমাত্রেরই জানা থাকা প্রয়োজন।

এ অজানাকে জানার- জিজ্ঞাসাই আমাকে এ 'শরণ-গ্রহণের পরম্পরা'-শীর্ষক গ্রন্থ-রচনায় মুখ্য প্রেরণা-বিন্দুরূপে কার্য্য করেছে। এ ছাড়া মা, বাবা ও ভাইবোনদের বিশেষত ভাই শ্রীসরিৎ বড়ুয়ার প্রেরণা সর্বাগ্রে স্মরণ করি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আজ হতে প্রায় দু বছর পূর্বে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তা গ্রন্থাকারে পাঠকের হাতে পৌঁছোতে পারে নি। নানা কারণে বিশেষত দিল্লীতে বাংলা অক্ষরে টাইপ করতে পারেন এমন অভিজ্ঞ কম্প্যুটর-কম্পোজারের অভাব থাকায় ইচ্ছে থাকলেও এর গ্রন্থাকারে সম্পাদন-কার্য্যটি আমার ইচ্ছাধীন ছিল না। বাংলায় লেখা আমার আরও গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে। গ্রন্থাকারে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারলে গ্রন্থকার দায়িত্বমুক্ত হয়। সাথে সে এক ধরণের স্বস্তি ও তৃপ্তি পায়। এক অভিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও আগ্রহী কম্প্যুটর-কম্পোজারের অভাব প্রতিপল অনুভব করছিলাম। সৌভাগ্যবশত আমার এ মনোদশা বুঝতে পেরে মা-বোনেরা ভাই সরিৎকে আমার সহায়তাদানে পাঠিয়ে দেয়। দিল্লী আসার পর হতেই যত্র তত্র পড়ে থাকা বাংলা-অক্ষরে লেখা বই-এর পাণ্ডুলিপিগুলো সে সংগ্রহ করে। স্বেচ্ছায় কম্পোজিং-এর কাজ শুরু করে দেয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই নিম্নলিখিত (পাণ্ডুলিপিগুলোর) বাংলা অক্ষরে টাইপ করে হাতে তুলে দিয়ে আমাকে তাক্ লাগিয়ে দেয়-

(০১) শরণ-গ্রহণের পরম্পরা,

(০২) মহাকচ্চায়নথের (বাংলায়),

(০৩) থেরীগাথা (বঙ্গানুবাদ),

(০৪) অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ),

(০৫) বোধিসত্ত্বের সিংহনাদ,

(০৬) মানবতার আলোকে বুদ্ধ পূর্ণিমা,

(০৭) বুদ্ধ পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা মাহাত্ম্য
ও বুদ্ধের জীবন-দর্শন,

(০৮) বুদ্ধ পূর্ণিমা ও অন্তিম বুদ্ধবাণী,

(০৯) বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ-দর্শন,

(১০) বুদ্ধের মৃত্যু-দর্শন,

(১১) পালি আর মাগধী ভাষা,

(১২) বৌদ্ধ-দর্শনে কাল ও কর্ম-মাহাত্ম্য,

(১৩) নির্বাণঃ মানব জীবনের লক্ষ্য,

(১৪) চরিয়াপিটক (বঙ্গানুবাদ),

(১৫) আজীবক উপক ও বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি,

(১৬) ক্ষুদ্রকপাঠ (বঙ্গানুবাদ),

(১৭) পালি পিটক-সাহিত্যে
বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থের জীবনচর্য্যা,

(১৮) ধর্মচক্র-প্রবর্তনসূত্র ও এর মাহাত্ম্যকথা,

এতগুলো বইয়ের পাণ্ডুলিপি বাংলা টাইপ অক্ষরে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম যে নিকট ভবিষ্যতে নিশ্চয় এগুলো এবার বাঙ্গালী পাঠকগণের পরশস্পর্শ লাভে সমর্থ হবে। সাথে তথাগত বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতির (***ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি। ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি।***) মর্ম বোধ হয়।

এতসব কাজে এগিয়ে গেলেও অর্থের অভাবে বহুদিন ওগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতে পারে নি। এত অর্থ-সামর্থ্যও নেই যে নিজেই প্রকাশকের দায়িত্ব পালন করি। বৌদ্ধ দেশগুলোতে সমাজের হিতে ও স্বার্থে, প্রয়াতদের স্মৃতি-রক্ষার্থে বা পুণ্যপ্রসাদ-লাভার্থে শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এধরণের ধর্মীয় গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব-ভার বহন করেন। সৌভাগ্যবশত গত বছর (সন ২০০৩) 'শান্তিনিকেতন ডক্টর আম্বেদকর বুড্ঢিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন' প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক আয়ুষ্মান বিনয়শ্রী মহাস্থবির দিল্লীতে আমার কাছে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে বাংলায় লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো দেখাই। কোন এক যোগ্য প্রকাশকের সন্ধান করার অনুরোধ জানাই। ওগুলোর মধ্য হতে একটি তুলে নিয়ে আয়ুষ্মান বিনয়শ্রী বললেন- 'ভন্তে, চিন্তে করবেন না। সবার আগে এর প্রকাশনার দায়িত্ব আমি নিলাম। এরপর একে একে অন্যগুলোর ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করব।' আনন্দের বিষয় কয়েক মাসের মধ্যে তিনি শ্রী মাণিক বরণ বড়ুয়ার অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত 'বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ' শীর্ষক গ্রন্থের কয়েকটি প্রতিলিপি আমার হাতে তুলে দেন। ১৯৮১ এ 'তেলকটাহগাথা' আর ১৯৯৮ সনে 'বাবা সাহেব ড. আম্বেডকর' গ্রন্থের আত্ম-প্রকাশের বহু বছর পর 'বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ'-শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় যারপরনাই আনন্দ লাভ করেছি। শুনেছি সমাজ-দরদী পাঠকের কাছে ওটি সমাদৃত হয়েছে।

এবার 'শরণ-গ্রহণের পরম্পরা'-শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনার পালা। কারণ প্রায় সব দিক থেকেই এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে তৈরী। এ গ্রন্থের প্রস্তুতিকরণের ব্যাপারে ভাই সরিৎ বড়ুয়ার সহযোগিতা ছাড়া আর যাদের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করি তারা হলেন নালন্দা-নিবাসী এবং বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যয়ণ বিভাগে I.C.H.R. এর Senior Fellowship প্রাপ্ত হয়ে *History of Genesis and Development of The Abhidhamma* বিষয়ে Post Doctoral গবেষণায় রত Dr. Satyendra Pandey, বাংলা লিপির ব্যবস্থা করে দেয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষা (পালি ও সংস্কৃত)

অধ্যয়ণ বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনবোধি মহাস্থবির, এবং বাংলাদেশাগত ও ভারত-সরকারের বৃত্তি-প্রাপ্ত আয়ুষ্মান কাত্যায়ণ ভিক্ষুগণকে আশীর্বাদ করি। এহেন জ্ঞান-বর্দ্ধক পূণ্য-কর্মের প্রভাবে তাদের সবার জীবন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক।

এ গ্রন্থ-প্রকাশনার ব্যাপারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৌদ্ধ নেতা ও সম্যক্ প্রকাশন-এর সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান শান্তি স্বরূপ 'শান্ত' -((Sri Shanti Swarup 'Shant') -এর ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজের হিতে স্বল্পমূল্যে বৌদ্ধ ধর্ম-সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশনার পরামর্শ বহু বছর পূর্বে আমি তাকে দিয়েছিলাম। তিনি সে পরামর্শ শিরোধার্য্য করেন। গর্বের বিষয় আজ তার প্রতিষ্ঠিত সম্যক্ প্রকাশনের মাধ্যমে ৩৫০ টি বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রকাশন হয়েছে। তিনি নিজেও একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। সাথে তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৌদ্ধ চিত্র-শিল্পী হওয়ায় তার এ গুণ গ্রন্থ-প্রকাশনার কাজে সোনায় সোহাগা সিদ্ধ হয়েছে। বছর দশেক পূর্বেও ভারতীয় সমাজের কোমল মতি শিশুদের যোগ্য বিশেষত হিন্দী ও বাংলা গ্রন্থ ছিল না। আজ তাদের জন্যে বিবিধ চিত্র-সম্বলিত প্রায় ৫০ টি বৌদ্ধ-গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আরও প্রায় ১০০ টি গ্রন্থ আত্ম-প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ভারতের অন্য কোন ভাষায়, এমন কি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এ ধরণের উদ্যোগ দৃষ্টিগোচর হয় না বললে মোটেই মিথ্যে হবে না। আজ এ সম্যক্ প্রকাশন-এর মাধ্যমে প্রকাশিত একাধিক হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ মারাঠী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, নেপালী, অসমিয়া, ইংরেজীতেও হচ্ছে। এভাবে তিনি তাঁর ব্যবসা-প্রসারের সাথে ধর্ম-প্রসারের কাজেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বাংলায় বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনার কাজেও তিনি রুচি রাখেন। অবাঙ্গালী হয়েও স্বেচ্ছায় এ গ্রন্থ-প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ায় তিনি এ গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন। বাংলা পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক-ব্যবসায়ীর কাছে তিনি এক নতুন নজির স্থাপন করলেন। এ গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত শান্তি স্বরূপ 'শান্ত'-এর সর্ববিধ সুখ, শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির মঙ্গল কামনা করি।

থাইল্যাণ্ডের Mahachulalongkon Rajavidyalaya (University)-র নিমন্ত্রণে Visiting Professor হিসেবে দু বছর পূর্বে Bangkok গিয়েছিলাম। এর প্রসিদ্ধ Wat Samvej- এ আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ বিহারের ব্যবস্থা ও পরিবেশ বড়ই সুন্দর। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অধ্যয়ণ করারও সময় পেতাম। ঐ সময়টাকে লেখনী-চালনার কাজে ব্যয় করি। ঐ অবসরেই এ গ্রন্থরচনার কাজ শুরু করি। বিভাগীয় কাজে ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্তবর্তী বহু প্রাচীন 'তাবাং বিহার'-এ যাবার পথে ডিব্রুগড়ের International Brotherhood Mission -এ ২৯ শে September, ২০০৪ অবস্থান করি। Mission -এর প্রতিষ্ঠাতা সেখানে থাকা-খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা করে দেয়ায় কয়েক ঘন্টা চিন্তন-মননের সুযোগ পেয়েছিলাম। ঐ অবসরে এ গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখে ফেলি। এ অবসর-দানের সুবাদে Wat Samvej -এর Phra Dr. Phol Chaivishu এবং International Brother Mission -এর Acarya Karuna 'Shastri' উভয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পাঠকগণের জ্ঞানোন্মেষণার কাজে এ গ্রন্থ যদি কোন প্রকারে সহায়কের ভূমিকা পালন করে তবে গ্রন্থ-রচনা সার্থক হয়েছে মনে করব। গ্রন্থের বিষয়-বস্তুকে আরও উপাদেয় ও বোধগম্য করে তোলার ব্যাপারে পাঠকের সমালোচনা ও পরামর্শ দুইই সাদরে সমাদৃত হবে।

ভবতু সব্বমঙ্গলং

স্থানঃ ডিব্রুগড়, আসাম
তারিখঃ ২৯/০৯/২০০৪
তিথিঃ মধু পূর্ণিমা,

ভিক্ষু সত্যপাল
অধ্যক্ষ, বৌদ্ধ অধ্যয়ণ বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী
বাসস্থানঃ ৫/১, বিশ্ববিদ্যালয় মার্গ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী -৭

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠাংক
১।	প্রাণীর জীবন	০১
২।	প্রাণীর শ্রেণীভেদ ও জীবন-স্তরের বিবিধতা	০১
৩।	জীবনের সার ও সমস্যা দর্শন	০২
	(ক) জীবন অনিত্যময়	
	(খ) জীবন দুঃখময়	
	(গ) জীবন অনাত্মময়	
৪।	শরণ-গ্রহণের উদ্দেশ্য	০৪
৫।	শরণ-গ্রহণের পরম্পরা	০৫
৬।	শ্রেষ্ঠ শরণের সন্ধান	০৫
৭।	ত্রিশরণ-গ্রহণের পরম্পরা	০৬
	(ক) প্রথম দ্বি-বাচিক উপাসক	
	(খ) পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের প্রব্রজ্যা-গ্রহণ (প্রথম দ্বি-বাচিক ভিক্ষু)	
	(গ) প্রথম ত্রি-বাচিক-উপাসক	
	(ঘ) প্রথম ত্রি-বাচিক-উপাসিকা	
৮।	ধর্মপ্রচারের অধিকার দান	১১
৯।	ত্রিশরণদানের অধিকার দান	১৩
১০।	ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল-গ্রহণের মাহাত্ম্য	১৯
১১।	ত্রিরত্ন-পরিচয় ও মাহাত্ম্য	২৩
১২।	ত্রিশরণ-গ্রহণের বিধি	২৭
১৩।	ত্রিশরণ-গ্রহণের উদ্দেশ্য	৩৩

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয় সূচী	পৃষ্ঠাংক
১৪।	শরণগ্রহণভেদ [১] (ক) লৌকিক শরণ-গমন (খ) লোকোত্তর শরণ-গমন [২] (ক) শৈক্ষ্য শরণ (খ) অশৈক্ষ্য শরণ [৩] (ক) আত্মসমর্পণ-শরণ (খ) তৎপরায়ণ-শরণ (গ) শিষ্যত্ব গ্রহণ-শরণ (ঘ) প্রণিপাত-শরণ	৩৪
১৫।	বুদ্ধবাদে কর্মবাদ [১] সংসার-চক্র-বর্দ্ধক কর্ম- (ক) পাপ (অসৎ বা অকুশল) কর্ম ও পাপ-কর্মের বিপাক (খ) পুণ্য (সৎ বা কুশল) কর্ম ও পুণ্য-কর্মের বিপাক [২] সংসার-চক্র-নিরোধক কর্ম (নয় কুশল নয় অকুশল-অব্যাকৃত কর্ম)	৪১
১৬।	পাপকর্মের দুষ্পরিণাম	৪৯
১৭।	দুঃখ-বর্জনের উপায়	৫২
১৮।	ত্রিশরণ-গ্রহণের ফল (ক) ভয়মুক্তি (খ) দেবগণের আরক্ষাবরণ (গ) দুর্গতি-মুক্তি ও সুগতি-প্রাপ্তি (ঘ) পরমার্থ-সত্য ও দুঃখমুক্তির জ্ঞান (ঙ) সত্য-শিব-সুন্দরের প্রাপ্তি	৫২

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয় সূচী	পৃষ্ঠাংক
১৯।	ত্রিশরণ-গ্রহণের সুফল-প্রাপ্তির সুনিশ্চিত আশ্বাসন	৫৯
২০।	ত্রিশরণ ও আত্মশরণ	৬১
২১।	ত্রিশরণ-গ্রহণ-পরম্পরার প্রাচীনতা	৬৭
২২।	'শরণ' ও 'সরণ'-শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ	৭২
২৩।	'শরণ' ও 'সরণ'-শব্দ-দুয়ের সারার্থ	৭৬
২৪।	ত্রিশরণ-গমনের পরম্পরা ও মানবের কর্তব্য	৭৬

শরণগ্রহণের পরম্পরা

প্রাণীর জীবন :

বৌদ্ধ ধর্ম মতে কোন কিছুই আকস্মিক ঘটে না। প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটার পেছনে কিছু না কিছু পূর্ব কারণ অবশ্যই থাকে। পূর্ব কারণের প্রভাবে বর্তমান কার্য্য বা ঘটনা ঘটে। এ দৃষ্টিতে প্রাণীর জীবনও একটি ঘটনা। এ ঘটনারও পূর্ব কারণ থাকা আবশ্যক। ঐ পূর্ব কারণ কি বা কে?

ভৌতিকবাদীরা প্রাণীর (জরায়ুজ) বর্তমান জীবনের 'কারণ' অনুসন্ধানের প্রয়াসে মাতাপিতার সহবাসকে 'কারণ'রূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু এমনও অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের জন্ম মাতাপিতার (সহবাস) অভাবেও হয়। এদের পূর্ব কারণ কি? এর রহস্যভেদ করার প্রয়াসে কিছু ধর্মগুরু ও দর্শনাচার্য্য দৈববাদ, নিয়তিবাদ আর ঈশ্বরবাদের চর্চা করেন। এদের মতে প্রাণীর জন্ম কোন অদৃশ্য দৈব বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় (কারণে) হয়ে থাকে। প্রাণীর জীবন ও জন্মের কারণরূপে শাস্তা বুদ্ধ তাঁর নিজেরই পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মকে দর্শান। তাঁর এ দর্শন জ্ঞানীগুণীসমাজে শুদ্ধ কর্মবাদ বা কার্য্যকারণবাদরূপে অতি চর্চিত।

প্রাণীর জীবন তার অনন্ত অতীত জন্মের অনন্ত কর্মের কর্মবিপাকে সৃষ্ট হয়েছে। অতীত ও বর্তমান জন্মের অনন্ত (পাপ ও পূণ্য) কর্মের কর্মবিপাকের পরিণামে এ

জীবনপ্রবাহ এ বর্তমান মৃত্যুকালসীমাকেও ভেদ করে ভবিষ্যতে অনির্বাণকাল অবধি ধাবিত হতে থাকে।

প্রাণীর শ্রেণীভেদ ও জীবন স্তরের বিবিধতা :

এ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রাণীর সংখ্যা কত শত সহস্র কোটি প্রকোটি হবে তার কোন নিশ্চিত সংখ্যা নেই। প্রাণীর সঠিক সংখ্যা গণনা করা তো দুরের কথা, প্রাণীগণের শ্রেণীসংখ্যাও সঠিকভাবে বলা এক দুষ্কর ব্যাপার। একই শ্রেণীর প্রাণীর জীবন ও জীবন-যাপন শৈলীর বিবিধতাও বিবিধ প্রকারের। এ বিবিধতার কারণ কি? বৌদ্ধ ধর্ম মতে প্রাণীর অনন্ত অতীত জন্মের অনন্ত প্রকারের কর্ম ও কর্মবিপাকই প্রাণীর শ্রেণীভেদ ও এত সব বিবিধতার মুখ্য কারণ।

জীবনের সার ও সমস্যা দর্শন :

জীবন, সে যে প্রাণীরই হউক না কেন, আর যে শ্রেণীরই হউক না কেন, তার তিনটি মুখ্য লক্ষণ। এ লক্ষণ তিনটি হল - (১) জীবন অনিত্যধর্মী, (২) জীবন দুঃখদায়ক, আর (৩) জীবন অনাত্মধর্মী।

জীবন অনিত্যময় : জীবন ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে বদলায়। এর এমন দু'টি অবস্থা বা কাল নেই যা একেবারে সমধর্মী। একে এক কথায় (অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায়) অনিত্যধর্মী বলা হয়। এর অনিত্যধর্মী হবার কারণ কি? প্রাণীর জীবনের (দৃশ্য ও অদৃশ্য; এবং ভৌতিক ও মানসিক) সংঘটক তত্ত্বসমূহ অনিত্যধর্মী ***(সব্বে সঙ্খারা***

অনিচ্চা'তি) হওয়ায় প্রাণীর জীবনও অনিত্যধর্মী হয়। এতে কারও কোন প্রকারের মতানৈক্য নেই।

জীবন দুঃখময় : জীবনটা অনুভূতিময় এক সতত প্রবহমান প্রবাহ। সামান্য জনজীবনে অনুভূত অনুভূতি দু প্রকারের - দুঃখানুভূতি ও সুখানুভূতি। অজ্ঞতাপূর্ণ জীবনে অনভূত দুঃখ-অনুভূতির মাত্রা ও পরিমাণ অন্য অনুভূতি অপেক্ষা অধিকতর হয় এবং অনভূত অন্য (সুখ) অনুভূতিও কালান্তরে দুঃখ-অনুভূতিতে পরিবর্তিত হয়। এ কারণে জীবনকে দুঃখময় ***(সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি)*** বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এতেও কারও কোন প্রকারের দ্বিমত নেই।

জীবন অনাত্মময় : জীবনের সংঘটক তত্ত্বসমূহে এমন কোন স্থির বা স্থায়ী বা নিত্য-ধ্রুব তত্ত্ব নেই ***(সব্বে সঙ্খারা অনত্তা'তি)*** যাকে নিঃসংশয়ে "ও আমার' বা 'আমি ওর" ***(এতং মম, এসো'হমস্মি)*** ধারণায় গ্রহণ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে এক কথায় বলা যেতে পারে জীবন 'অনাত্মধর্মী' ***(নেতং মম, নেসো'হমস্মি)***।

উপরোক্ত তিনটি লক্ষণের মধ্যে দুঃখ-লক্ষণের ন্যায় প্রথম ও তৃতীয় লক্ষণ দু'টি প্রাণীর জীবনে ততটা অকাম্য নয়। তবে এ দুঃখের সৃজনে উপরোক্ত দু'টি লক্ষণের (অনিত্যতা ও অনাত্মতা) প্রতি প্রাণীর 'নিত্য' ও 'আত্ম' (সৎকায়)-ধর্মী দৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একে তো বর্তমান দুঃখ প্রাণীমাত্রেরই অকাম্য, তার উপর ভাবী জীবনের অনাহুত ও অনভীষ্ট দুঃখের সম্ভাবনা তাকে

ভাবিয়ে তোলে। শংকিত করে তোলে। বিষিয়েও তোলে। ভাবী জীবনের সম্ভাব্য, অকাম্য ও অনভিষ্ট দুঃখের মাত্রার অনিশ্চিততাও জীবনকে আরও দুঃখময় করে তোলে। ঐ সম্ভাব্য দুঃখের স্থায়ীত্ব কতখানি দীর্ঘস্থায়ী হবে তার অনিশ্চিততাও চিন্তাশীল ও সংবেদনশীল প্রাণীকে আরও ভাবিয়ে তোলে। জরাজনিত ভয়, ব্যাধিজনিত ভয় ও মরণজনিত ভয় প্রাণীকে সদা ভীত-ত্রস্ত করে রাখে। এ ছাড়াও রয়েছে আরও বহু ধরণের ভয়। যেমন অর্জিত বা কাম্য বস্তু হারানোর ভয়, প্রিয়জনের বিয়োগের ভয়, আর অপ্রিয়জনের সংযোগের ভয়। এ সব ভয়ও প্রাণীকে অনেকটা ভাবিয়ে তোলে। এর পর রয়েছে মৃত্যুর পর অনিশ্চিত যোনিতে জন্ম নেবার ভয়। ভয় অর্থাৎ দুঃখ।

শরণগ্রহণের উদ্দেশ্য :

দুঃখ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরও অকাম্য। সবাই চায় বাধাবিহীন সুন্দর, সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন। সম্ভব হলে দীর্ঘজীবনও সবার কাম্য। এ লক্ষ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দুর্বল সবলের কাছে যায়, আর বল প্রার্থনা করে। নির্ধন ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির কাছে যায়, আর ধন চায়। দুঃস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির কাছে যায়, আর সুস্বাস্থ্য ও স্বস্তি প্রার্থনা করে। মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে যায়, আর চায় জ্ঞান। নিরাশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়যুক্ত প্রাণীর কাছে যায়, আর আশ্রয় প্রার্থনা করে। দৃষ্টিহীন প্রাণী চক্ষুষ্মান প্রাণীর কাছে দৃষ্টি প্রার্থনা করে। এ প্রক্রিয়ায় এক প্রাণী তার সমকক্ষ বা সমশ্রেণীর প্রাণীর কাছে যায়। অনেক ক্ষেত্রে সে তার তুলনায় হীন শ্রেণীর

প্রাণীর কাছেও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যায়। এমন কি পরিস্থিতিতে বিবশ হয়ে এক চেতনশীল প্রাণী অন্য অচেতন তত্ত্বের শরণপ্রার্থী হতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় এক প্রাণীর অন্য চেতন প্রাণীর বা অচেতন তত্ত্বের কাছে যাওয়া ও তার কাছ হতে কিছু চাওয়াকে বা প্রত্যাশা করাকে শরণগ্রহণ বলা হয়।

শরণগ্রহণের পরম্পরা :

এ শরণগ্রহণের এক সুদীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। এ পরম্পরার শুরু ঠিক কখন হয়েছে তা বলা না গেলেও, এ কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে প্রাণীর সৃষ্টির সাথে শরণগ্রহণের পরম্পরার সূত্রপাত হয়। আর মানব মনের ও মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে শরণপ্রার্থী ও শরণদাতা হবার এবং শরণদানের প্রক্রিয়াতে বিবিধতা এসেছে প্রচুর।

শ্রেষ্ঠ শরণের সন্ধান :

মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনে করে। শুধু তা নয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও করে। এতেও সে ক্ষান্ত হয় না। সে এমন এক শরণের সন্ধানে থাকে যা তাকে অন্য শরণ অপেক্ষা অধিকতর রক্ষা করে, অধিকতর নির্ভয়তা প্রদান করে এবং দীর্ঘস্থায়ী সুখ-সুবিধা প্রদান করে। এ প্রয়াসের সুপরিণামে ত্রিশরণগ্রহণের পরম্পরার উদ্ভব ও বিকাশ হয়।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদন তাঁকে অধিকাধিক সুখ-সুবিধাদানের, অধিকাধিক জ্ঞান দানের, অধিকাধিক সুরক্ষা প্রদানের, অধিকাধিক আমোদ-প্রমোদ দানের বিবিধ

উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পিতা ও পুত্রের কেহই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন নি। 'রাজকুমার কোন অভাবে তো নেই?' এ ধরণের সুপ্ত দুশ্চিন্তায় চিন্তা-গ্রস্ত থাকতেন রাজকুমারের মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজন-পরিজনদের প্রত্যেকেই। অন্যদিকে কুমার সিদ্ধার্থের মনেও সব সময় এক প্রশ্ন জাগত --- 'এ সব সুখ-সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদ ক্ষণস্থায়ী নয় কি? সবই তো ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী সুখ-সুবিধা ও আমোদ-প্রমোদ সবই দুঃখদায়ী ও দুঃখবর্দ্ধক।' কাজেই তাকে এক দীর্ঘস্থায়ী এক চিরস্থায়ী সুখের সন্ধান পেতে হবে। এর প্রয়াসে তিনি গৃহত্যাগ করেন। এ গৃহত্যাগ (নিষ্ক্রমণ) অপর সব গৃহত্যাগীর গৃহত্যাগ অপেক্ষা সবদিক থেকে অতুলনীয় হওয়ায় একে মহাভিনিষ্ক্রমণ বলা হয়।

ত্রিশরণ-গ্রহণের পরম্পরা :

প্রথম দ্বিবাচিক উপাসক

ভিখারীর বেশে তিনি দেশে দেশে বিচরণ করেন। এক শ্রেষ্ঠ শরণের সন্ধানে তিনি শেষে উরুবেলায় পৌঁছোন। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে নৈরঞ্জনা নদীর তীরবর্তী উরুবেলা গ্রামের (বর্তমান বুদ্ধগয়া) বোধিবৃক্ষতলে বোধিসত্ব তাপস সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর ক্রমান্বয়ে সাত সপ্তাহ বোধিবৃক্ষ ও এর আশেপাশের আরো ছয়টি স্থানে বিমুক্তিরসের আস্বাদানে কাটান। ঐ সময় শাস্তা যখন রাজ-আয়তন বৃক্ষের তলে বসে সপ্তম সপ্তাহ কাটান, তখন তপস্সু ও ভল্লিক নামে

প্রথম দ্বি-বাচিক উপাসক ---- তপস্‌সু ও ভল্লিক।

দু'জন ব্যবসায়ী উৎকল (বর্তমান উড়িষ্যা) হতে উরুবেলা হয়ে দুরে কোথাও ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁদের জ্ঞাতিদেবতার পরামর্শে ঐ দু'জন ব্যবসায়ী শাস্তাকে তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উনপঞ্চাশ দিন পর প্রথম অন্নদান দেন। অন্নদানের পর তাঁরা দু'জন ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় আমরণ বুদ্ধের ও তাঁর ধর্মের শরণাপন্ন উপাসক হবার সংকল্প ব্যক্ত করে বলেন ---

"এতে ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম,
ধম্মং চ। উপাসকে নো, ভগবা, ধারেতু
অজ্জতগ্গে পাণুপেতে সরণং গতে'তি।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

শাস্তা মৌনভাব অবলম্বন করে তাদের অনুরোধে স্বীকৃতি দান করেন। শাস্তার স্বীকৃতি পেয়ে তারা দু'জন আনন্দে বিভোর হয়ে শাস্তার কাছ থেকে স্মারক কিছু পাবার প্রার্থনা জানান। তাদের অনুরোধ রক্ষার্থে শাস্তা তাঁর মাথা হতে কিছু কেশ (চুল) দেন। বার্মার (ম্যানমার) বৌদ্ধ সাহিত্য মতে বিশ্বাস করা হয় যে ঐ দু'জনের একজন শাস্তার দেয়া কেশগুচ্ছের সংরক্ষণার্থে বার্মায় একটি বিশাল স্বর্ণময় স্তূপ তৈরী করিয়েছিলেন। ঐ স্তূপ আজও স্বে-ড্যাগন প্যাগোডা নামে জগৎ বিখ্যাত। এখানে উল্লেখনীয় যে ঐ দু'জন ব্যবসায়ী যে ভাষায় ও যে শৈলীতে শরণগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন তা শাস্তার বানানো বা শেখানো ভাষা-শৈলী নয়। তা ছিল ঐ দু'জন ব্যবসায়ীর নিজস্ব। শাস্তা অহেতুক কাউকে কোন দিন তাঁর শরণাপন্ন হবার উদ্দেশ্যে নিজে

থেকে আদেশ বা নির্দেশ দেন নি। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মে ও সাহিত্যে শরণগ্রহণের পরম্পরা প্রচলিত হবার উল্লেখ পাই। সংঘ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাঁদেরকে কেবল বুদ্ধের ও ধর্মেরই শরণ নিতে হয়েছিল। এ কারণে বৌদ্ধ সাহিত্যে ঐ দু'জন উপাসক দ্বে-বাচিক উপাসকরূপে অতিখ্যাত।

এর পর কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসীর নিকটবর্তী ঋষিপত্তন-মৃগদাব নামে অতি বিখ্যাত এক নয়নাভিরাম উদ্যানে শাস্তা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে পৌঁছান। ঐ দিনই তিনি তাঁর প্রাক্তন পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ শিষ্যকে সম্বোধন করে প্রথম উপদেশ দেন। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে তা ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্র নামে অতি পরিচিত। শাস্তার অনুপম দেশনাশৈলীতে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক বিষয়ও তাদের কাছে সুগম হয়। পর্য্যায়ক্রমে স্রোতাপন্ন হয়ে তাঁরা নির্বাণমার্গে প্রতিপন্ন হন।

পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের প্রব্রজ্যা গ্রহণ :

ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্রে দেশিত দেশনা শুনে শ্রোতাদের (পঞ্চবর্গীয় শিষ্য) প্রত্যেকে স্রোতাপন্ন হন এবং তিন পর্য্যায়ে তাঁরা শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা যাচনা করে বলেছিলেন ----

"লভেয়্যাহং / লভেয়্যাম, ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে
পব্বজ্জং, লভেয়্যং উপসম্পদং" (মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

[ভন্তে, ভগবানের কাছে আমি/আমরা প্রব্রজ্যা উপসম্পদা যাচনা করছি।]

প্রথম দ্বি-বাচিক ভিক্ষু---- পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু।

প্রত্যুত্তরে ***"এহি ভিক্খু"*** বা ***"এথ ভিক্খবে"*** সম্বোধন করে শাস্তা তাঁদের প্রব্রজ্যা/ উপসম্পদা দেন।

শুধু শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা যাচনা করলেও পরোক্ষে তাঁরা শাস্তা তাঁর আবিস্কৃত ও প্রবর্তিত ধর্মের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্য্যায়ে শাস্তা তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে অনাত্ম-পর্য্যায় নামক উপদেশ দেন। শ্রোতারা স্মৃতি সহকারে তা শুনে অরহত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

ত্রিশরণ-গ্রহণের পরম্পরা :

প্রথম ত্রিবাচিক উপাসক

এর পর বারাণসীর শ্রেষ্ঠী পরিবারের যশ নামক এক কুলপুত্রও বুদ্ধসান্নিধ্যে এসে ক্রমান্বয়ে স্রোতাপন্ন ও অরহত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। যশের পিতাও শাস্তার ধর্মোপদেশ শোনার সুযোগ পান। এতে লাভান্বিত হয়ে তিনিও আর্য্য মার্গের প্রথম সোপানে উন্নীত হন। স্রোতাপন্ন হয়ে যশের পিতা শাস্তার কাছে আমরণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন উপাসকরূপে স্বীকার করার আবেদন জানিয়ে বলেন --

"এসাহং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি,
ধম্মং চ, ভিক্খু-সংঘং চ। উপাসকং মং,
ভগবা, ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতে সরণং গতং তি।"

(মহাবগ্গ)

প্রথম ত্রি-বাচিক উপাসক---- যশ।

মৌনভাব অবলম্বন করে শাস্তা তার প্রার্থনা স্বীকার করেন। এতে আনন্দাপ্লুত হয়ে বাসভবনে ফিরে যাবার প্রাক্কালে যশের পিতা শাস্তাকে সশিষ্য তাঁর ঐ দিনের অন্ন-গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেন। শাস্তা মৌনভাব অবলম্বন করে অন্ন-গ্রহণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। যশের পিতা বাসভবনে ফিরে যান। এভাবে যশের পিতা সংসারের প্রথম ত্রিশরণগমনপূর্বক ত্রিশরণাগত ত্রিবাচিক (তেবাচিক) উপাসক হবার সুবর্ণ অবসর লাভ করেন ***(সো'ব লোকে পঠমং উপাসকো অহোসি তেবাচিকো)***।

প্রথম ত্রিবাচিকা উপাসিকা :

এভাবে গৌতম বুদ্ধের শাসনে ত্রিশরণ-গমনের পরম্পরার শুভারম্ভ হয়। যশের পিতাকে ধর্মদেশনা দানকালে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ তাঁর আধ্যাত্মিক লাভের প্রত্যবেক্ষণ করতে থাকেন। প্রত্যবেক্ষণকালে যশ ক্ষীণাশ্রব হন। অরহত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই যশ শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা যাচনা করেন। প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেন। এর পর পূর্বাহ্ন বেলায় শাস্তা সশিষ্য যশের পিতার বাসভবনে যান। যশের পিতা, মাতা ও যশের প্রাক্তন পত্নী সবাই মিলে শাস্তার সাদর সৎকার করেন। সুস্বাদু খাদ্য-ভোজ্য-লেহ্য-পানীয়াদি দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পরিতৃপ্তি দান করেন। দানানুমোদনকালে শাস্তা আনুক্রমিক ধর্মোপদেশ দিয়ে যশের মাতা ও পূর্বপত্নীর আর্য্যমার্গফল প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করেন। স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফলে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা উভয়ে শাস্তা বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও

প্রথম ত্রি-বাচিকা উপাসিকা--- যশের পত্নী ও মাতা।

সংঘের আমরণ ত্রিশরণাগত উপাসিকারূপে স্বীকার করার যাচনা করে বলেন ---

"এতা ময়ং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছাম,
ধম্মং চ ভিক্খু-সংঘং চ। উপাসিকায়ো নো
ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতা সরণং গতা তি।"

(মহাবগ্গ/বিনয়পিটক)

শাস্তা এবারও মৌনভাব ধারণ করে তাঁদের দু'জনার (যশের মা ও তাঁর পূর্ব পত্নী) অনুরোধ স্বীকার করেন। এভাবে সংসারে মহিলাদের মধ্যে এ দু'জন মহিলাই প্রথম ত্রিশরণাগত (তেবাচিকা) উপাসিকারূপে খ্যাতিপ্রাপ্তা হন *(তা'ব লোকে পঠমং উপাসিকা অহেসুং তেবাচিকা)*।

ধর্মপ্রচারের অধিকার দান :

যশের অরহত্ব ও প্রব্রজ্যা লাভের খবর শুনে, প্রথম পর্য্যায়ে তাঁর চার শ্রেষ্ঠীপুত্র বন্ধু আর পরবর্তী পর্য্যায়ে যশের আরও পঞ্চাশ জন শ্রেষ্ঠীপুত্রবন্ধু শাস্তার মুখারবিন্দে দেশিত দেশনা শোনার পর স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রব্রজ্যাপ্রার্থী হলে তাঁদের সবাইকে শাস্তা প্রব্রজ্যাদান দেন। এভাবে ভিক্ষু-সংঘের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে একষট্টি জন হয়।

শাস্তা অপর ষাট জন অর্হৎ ভিক্ষুকে একত্রিত করে তাঁদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়ে বলেন ---

"চরথ, ভিক্খবে, চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ, ভিক্খবে, ধম্মং আদিকল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

["হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে দেবমানুষের হিতে ও সুখে আদি মধ্য ও অন্তে কল্যাণকারী ধর্মপ্রচারে আর সার্থক সব্যঞ্জক ধর্মপ্রচারে গ্রামে গ্রামান্তরে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়। একপথে দু'জন যেও না। পরিপূর্ণ কৈবল্য পরিপূরক ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ কর।"]

শাস্তার আদেশ পেয়ে ষাটজন অর্হৎ ভিক্ষু জম্বুদ্বীপের মধ্যম মণ্ডলের বিভিন্ন গ্রামে ও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন সদ্ধর্ম প্রচারে। শাস্তা নিজেও তাঁর নিজ নির্দেশমতে বারাণসী হতে উরুবেলা হয়ে মগধের রাজধানী রাজগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হন। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া ভিক্ষু-সংঘের ধর্মোপদেশ শুনে উৎসাহিত প্রব্রজ্যাপ্রার্থীদেরকে, স্থবির-মহাস্থবিরগণ চারিকারত শাস্তার অবস্থানের খোঁজ নিয়ে শাস্তার কাছে নিয়ে যেতেন। শাস্তা আগন্তুক প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে ***'এহি ভিক্খু'*** (এস ভিক্ষু) বা প্রব্রজ্যাপ্রার্থীদেরকে ***'এথ ভিক্খবে'*** (এস ভিক্ষুগণ) বলে সম্বোধন করে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রদান করতেন। যাতায়াতের যাত্রাপথে নবাগন্তুক প্রব্রজ্যাপ্রার্থীদের ও তাদের দিগ্দর্শক কল্যাণমিত্র ভিক্ষুগণের উভয়কেই নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন

হতে হতো। একবার একান্ত সেবনকালে শাস্তা তা অনুভব করেন। অনুকম্পাবশত উপস্থিত ভিক্ষুগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেন --

"প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রার্থীকে আমার কাছে না এনে (অযথা কালক্ষয় না করে) প্রার্থনাস্থলে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা দান করবে।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

উপস্থিত ভিক্ষু-সংঘের সদস্যগণ জানতে চান-'ভন্তে, প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা কিভাবে বা কোন্ বিধিতে দেয়া হবে?'

ত্রিশরণদানের অধিকার দান :

উত্তরে শাস্তা বলেন ---

"অনুজানামি, ভিক্খবে, তুম্হে' ব' দানি তাসু তাসু দিসাসু
তেসু তেসু জনপদেসু পব্বাজেথ উপসম্পাদেথা' তি।"
এবং চ পন, ভিক্খবে, পব্বাজেতব্বো উপসম্পাদেতব্বো--

পঠমং কেসমস্সুং ওহারাপেত্বা,
কাসায়ানি বত্থানি অচ্ছাদাপেত্বা,
একংসং উত্তরাসংগং কারাপেত্বা,
ভিক্খুনং পাদে বন্দাপেত্বা,
উক্কুটিকং নিসীদাপেত্বা,
অঞ্জলিং পগ্গণ্হাপেত্বা;
'এবং বদেহী' তি, বত্তবো ---

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি;
ধম্মং সরণং গচ্ছামি;
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

দুতিয়ংপি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি;
দুতিয়ংপি ধম্মং সরণং গচ্ছামি;
দুতিয়ংপি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

ততিয়ংপি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি;
ততিয়ংপি ধম্মং সরণং গচ্ছামি;
ততিয়ংপি সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।

"অনুজানামি, ভিক্খবে, ইমেহি তীহি সরণ-গমনেহি পব্বজং উপসম্পদং তি।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

[হে ভিক্ষুগণ, আদেশ দিচ্ছি- তোমরা যে দিকেই যাও না কেন আর যে জনপদেই যাও না কেন (প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রার্থীকে) সেখানেই প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা দেবে। হে ভিক্ষুগণ, এভাবে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা দেবে ----

প্রথমত, কেশ-দাড়ি কামিয়ে ফেলাতে হবে, কাষায় (গৈরিক) বস্ত্রাদি দিয়ে দেহ ঢাকিয়ে ফেলাতে হবে, উত্তরাসংগ দিয়ে এক কাঁধ খোলা রাখতে হবে, ভিক্ষুগণের পাদস্পর্শ করিয়ে বন্দনা করাতে হবে, দু পায়ের আঙ্গুলে ভর (উৎকুটিক মুদ্রায়) দিয়ে বসাতে হবে, অঞ্জলীবদ্ধকর করিয়ে 'এভাবে বল' বলতে হবে –

"বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি;
ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি;
সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

দ্বিতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি;
দ্বিতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি;
দ্বিতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।

তৃতীয়বারও বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি;
তৃতীয়বারও ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি;
তৃতীয়বারও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করছি।"

এভাবে, হে ভিক্ষুগণ, ত্রিশরণগমনের মাধ্যমে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা-দানের আদেশ দিচ্ছি।

শাস্তার উপরোক্ত আদেশ হতে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা-প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ত্রিশরণগ্রহণের পূর্বে কেশ-দাড়ি কামিয়ে, গেরুয়া বস্ত্রে এক কাঁধ খোলা রেখে দেহ আচ্ছাদিত করার বিশেষ মুদ্রায় বসা বা বসানোটা নিতান্তই আবশ্যক (প্রাথমিক) কর্তব্য-রূপে নিশ্চিত করা হয়েছিল। তা না করে কাউকে ত্রিশরণ-গ্রহণ করতে দেয়া হতো না।

"অনুজানামি, ভিক্খবে, ইমেহি তীহি সরণগমনেহি
পব্বজ্জং উপসম্পদং তি।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

অর্থাৎ [ত্রিশরণগমনবিধিতে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা দানের আদেশ দিচ্ছি।]

প্রথম বর্ষাবাস শেষে শাস্তা উরুবেলা (বর্তমান বুদ্ধগয়া) হয়ে তিন কাশ্যপ জটাধারী ভাই ও তাঁদের হাজার শিষ্যদের নিয়ে রাজগৃহ অভিমুখে রওনা দেন। রাজগৃহে পৌঁছে সীমান্তবর্তী পাহাড় ঘেষা যষ্টিবনের এক সুপ্রতিষ্ঠিত চৈত্যে শাস্তা সশিষ্য অবস্থান করেন। মগধ-রাজ বিম্বিসার এ খবর পেয়ে জ্ঞাতিমিত্র, স্বজন, পরিজন, সভাপরিষদ ও অগণিত মগধবাসীদের নিয়ে শাস্তার দর্শনে যান। মগধরাজ বিম্বিসার প্রমুখ মগধবাসীকে সম্বোধন করে এক বিশেষ ধর্মদেশনা দেন। ধর্মদেশনা শোনার পর শ্রোতারা নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে লাভান্বিত হন। এদের অনেকে উপাসকত্ব বরণ করেন। অনেকে আর্য্যফলের বিবিধ অবস্থার অধিকারী হন। মগধরাজ বিম্বিসার প্রথম আর্য্যফলে (স্রোতাপত্তি) প্রতিষ্ঠিত হন। নানাভাবে তাঁর প্রসন্নতা শাস্তার কাছে ব্যক্ত করেন। বার্তালাপ শেষে তিনি শাস্তার কাছে উপাসকত্ব বরণ করার নিবেদন করে বলেন-

"এসাহং, ভন্তে, ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং চ,
ভিক্খু-সংঘং চ। উপাসকং মং, ভন্তে, ভগবা ধারেতু।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

[আমি, ভন্তে, ভগবানের শরণাপন্ন হলাম। সাথে ধর্ম ও ভিক্ষু-সংঘেরও শরণাপন্ন হলাম। আমাকে, ভন্তে ভগবান, উপাসকরূপে ধারণ করুন (জানুন)।]

এভাবে বুদ্ধকালীন রাজা মহারাজাদের মধ্যে মগধরাজ বিম্বিসারই প্রথম ত্রিশরণাগত উপাসক হবার গৌরব প্রাপ্ত হন। এরপর হতেই মগধ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতেও ত্রিশরণাগত উপাসক হবার পরম্পরাটি সুব্যবস্থিত হয়। এখানে উল্লেখনীয় যে গৃহীদের ত্রিশরণগ্রহণ (উপাসকত্ব বরণ)-কালে প্রব্রজ্যাপ্রার্থীদের ন্যায় কেশ-দাড়ি কামানোর ব্যাপারে কোন প্রকারের আদেশ শাস্তা কখনও দেন নি। স্বেচ্ছায় কেহ কেশচ্ছেদন বা মুণ্ডন করে থাকলে তাকে বাধা দেবারও কোন উল্লেখও কোথাও পাওয়া যায় না।

কিন্তু সংঘের উদয় ও বিকাশের প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে শাস্তার সান্নিধ্যে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করেছেন এমন প্রার্থীদের মধ্যে অগ্রশ্রাবক মহাশ্রাবক সারীপুত্র ও মহামৌদ্গাল্যায়ণকেও শরণ যাচনা কালে বলতে শুনতে পাই ----

"লভেয়্যাম ময়ং, ভন্তে, ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং,
লভেয়্যাম উপসম্পদ'ন্তি।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

তাঁদের প্রত্যেকে প্রত্যক্ষে কেবল শাস্তার শরণাপন্ন হলেও পরোক্ষে তাঁরা ধর্মেরও শরণাপন্ন হয়েছেন। এবং শাস্তার ***"এহি ভিক্খু"*** বা ***"এথ ভিক্খবে"*** বাক্য-উচ্চারণের মাধ্যমে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা (দীক্ষা) লাভের কাল হতে তাঁরা সংঘেরও শরণাপন্ন হন।

সপ্তম বর্ষাবাস শেষে শাস্তা রাজগৃহ হতে কপিলবস্তু যান। কপিলবস্তুর ন্যাগ্রোধারামে তিনি অবস্থান করেন। ঐ যাত্রায় রাহুলের অনুরোধে শাস্তা ধর্মসেনাপতি মহাশ্রাবক সারীপুত্রপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়ে বলেন- "রাহুলকে 'ত্রিশরণগমন'-বিধিতে প্রব্রজ্যা দেবে।"

"অনুজানামি, ভিক্খবে, তীহি সরণগমনেহি সামণের-
পব্বজ্জং।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

শিক্ষাপদের বিধান :

রাহুলের প্রব্রজ্যার পর কপিলবস্তুবাসী আরও কিছু বালক শ্রামণেররূপে প্রব্রজ্যিত হয়। একদিন তাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগে 'আমাদের শিক্ষণীয় শিক্ষাপদ কি কি হবে?'

"কতি নু খো অম্হাকং সিক্খাপদানি,
কথ চ অম্হেহি সিক্খিতব্বন্তি?"

(খুদ্দকপাঠ-অট্ঠকথা)

বিষয়টি শাস্তাকে জানানো হয়। প্রসঙ্গক্রমে শাস্তা শ্রামণেরগণের পালনীয় দশশিক্ষাপদের প্রথম বিধান দিয়ে বলেন ---

"অনুজানামি, ভিক্খবে, সামণেরানং দস-
সিক্খাপদানি। তেসু চ সামণেরেহি সিক্খিতুং।"

পাণাতিপাতা বেরমণী, অদিন্নাদানা বেরমণী,
অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী, মুসাবাদা বেরমণী,

রাহুলের অনুরোধে ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে
ত্রি-শরণ দানের মাধ্যমে প্রব্রজ্যাদানের শাস্তার নির্দেশ।

সুরামেরেয়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী,
বিকালভোজনা বেরমণী, নচ্চগীতবাদিত-
বিসূকদস্সনা বেরমণী, মালাগন্ধবিলেপন-
ধারণমণ্ডণবিভূসনট্ঠানা বেরমণী,
উচ্চসয়না মহাসয়না বেরমণী,
জাতরূপরজতপটিগ্গহণা বেরমণী।

অনুজানামি, ভিক্খবে, সামণেরানং ইমানি দসসিক্খাপদানি, ইমেসু চ সামণেরেহি সিক্খিতুং তি।"

(মহাবগ্গ-বিনয়পিটক)

ত্রিশরণগমনের সাথে দশশিক্ষাপদ-গ্রহণের বা দশশিক্ষাপদ-দানের পরম্পরা যুক্ত হওয়ায় বৌদ্ধ ধর্মে এর ধর্মীয় মর্য্যাদা পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়।

ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল-গ্রহণের মাহাত্ম্য :

আগারিক (গৃহস্থ) ও অনাগারিক (গৃহহীন) ভেদে বুদ্ধ-শিষ্যশিষ্যা দু শ্রেণীর। অনাগারিক (শ্রামণ্য-) জীবনে ত্রিশরণগমনের মাহাত্ম্যকথায় আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু আগারিক (গৃহী) জীবনে ত্রিশরণগমনের মাহাত্ম্যকথায় তেমন আলোকপাত এ অবধি করা হয় নি। এর অর্থ এ নয় যে শাস্তা তথাগত বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে কিছুই বলেন নি বা তেমন কোন গুরুত্ব দেন নি। শাস্তা কোনদিনই কাউকে এক বিশেষ জীবনশৈলী গ্রহণে বাধ্য করেন নি; হ্যাঁ, তবে উপরোক্ত দু শ্রেণীর জীবনশৈলীর বিশেষতা স্পষ্টভাবে, কখনও কখনও প্রকারান্তরে অবশ্যই

বোঝাতেন। যেমন- ***"সম্বাধো ঘরাবাসো, রজোপথো, অব্ভোকাসো পব্বজ্জা" (সামঞ্ঞফলসুত্ত/ দীঘনিকায়)*** শাস্তার ধর্মোপদেশদানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সেখানে থেকেই ধর্মজীবন যাপন করুক আর জীবনকে সফল ও সার্থক করুক। এ প্রসঙ্গে গৃহীজীবনেও ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল-গ্রহণের মাহাত্ম্যকথা সংযুক্ত-নিকায়ের মহানামসূত্রে সংক্ষেপে চর্চিত হয়েছে।

একবার শাস্তা শাক্যগণের নগরী কপিলবস্তুর নিগ্রোধারামে বিহার করছিলেন। তাঁর ঐ অবস্থান-কালে শাক্যকুলের রাজকুমার মহানাম শাক্য শাস্তার কাছে আসেন। বন্দনান্তে তিনি শাস্তার কাছে কথাপ্রসঙ্গে জানতে চান ----

"কিত্তাবতা নু খো, ভন্তে, উপাসকো হোতী' তি?"

(মহানামসুত্ত-অঙ্গুত্তরনিকায়)

[ভন্তে, ভগবান, কোন এক ব্যক্তি কিভাবে উপাসক (উপাসকত্ব অর্জন করেন) হন?]

উত্তরে শাস্তা বলেন ----- ***"যতো খো, মহানাম, বুদ্ধং সরণং গতো, ধম্মং সরণং গতো, সংঘং সরণং গতো হোতী' তি।"***

[হে মহানাম, কোন এক ব্যক্তি বুদ্ধের, ধর্মের ও সংঘের শরণাপন্ন হয়ে উপাসক হয়ে পড়েন (উপাসকত্ব অর্জন করেন)।]

এর পর মহানাম আবারও শাস্তাকে জিজ্ঞেস করেন ---
"কিত্তাবতা পন ভন্তে, উপাসকো সীলবা হোতী' তি?"

[ভগবান, কোন এক ব্যক্তি (উপাসক) শীলবান হয় কি করে?]

উত্তরে শাস্তা স্পষ্টভাবেই বলেন -----

"যতো খো, মহানাম, উপাসকো পাণাতিপাতা পটিবিরতো হোতি, অদিন্নাদানা পটিবিরতো হোতি, কামেসু মিচ্ছাচারা পটিবিরতো হোতি, মুসাবাদা পটিবিরতো হোতি, সুরামেরেয়- মজ্জপ্পমাদট্ঠানা পটিবিরতো হোতি, এত্তাবতা খো, মহানাম, উপাসকো সীলসম্পগ্গো এত্তাবতা খো, মহানাম, উপাসকো সীলসম্পন্নো হোতী' তি?"

(সংযুত্তনিকায়)

[হে মহানাম, প্রাণীহত্যা হতে বিরত থেকে, অদত্ত (বস্তু) গ্রহণ হতে বিরত থেকে, মিথ্যা কামাচার (ব্যভিচার) হতে বিরত থেকে, আর বিবিধ প্রকারের মাদক দ্রব্যের সেবন হতে বিরত থেকে এক ব্যক্তি (উপাসক) শীলবান হতে পারেন।]

পঞ্চশীল পালন না করে কেবল মাত্র ত্রিশরণগ্রহণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি উপাসক হয়ে পড়লেই (উপাসকত্ব অর্জন করলেই) ত্রিশরণ-গ্রহণের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয় না। এতে পঞ্চশীল-গ্রহণের ঔচিত্য কোথায়? ত্রিশরণ-গ্রহণের (ত্রিরত্নের উপাসক হবার) মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবনকে নিরন্তর বিকাশোন্মুখ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে রাখা।

কপিলবস্তুর নিগ্রোধারামে উপাসক মহানামের অনুরোধে
উপাসকত্ব অর্জনের ব্যাপারে শাস্তার দেশনা।

সংযুক্তনিকায়ের পঞ্চশীলসূত্রে নারীদের জীবনে পাঁচ দুঃশীলতার (দুরাচারী-কদাচারী হবার) দুরগামী দুষ্পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রমতে প্রাণী-হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, মাদক-দ্রব্যাদি সেবনজনিত দুঃশীলতার দুষ্প্রভাবে দুরাচারিণী নারীর ইহ (-লৌকিক) ও পারলৌকিক দু জীবনই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক জীবনে তো তা দুষ্কর্মীকে পতনোন্মুখ করেই, সাথে দুর্গতিও দান করে। এরপর পারলৌকিক জীবনেও তা এমন দুষ্কর্মীদের নরকে ঠেলে দেয় আর নারকীয় যাতনা ভুগতে বাধ্য করায়। শীললঙ্ঘন ও শীলপালন শুধু নারী জীবনকেই প্রভাবিত করে না, পুরুষবর্গকেও সমানভাবে প্রভাবিত করে। এ কারণে যে বা যারা নিরন্তর উন্নতিশীল, সুখী ও সমৃদ্ধশালী হতে আর সব দিক থেকে সুরক্ষা পেতে চান তাদের উচিত শীললঙ্ঘনের প্রবৃত্তি বর্জন করে শীলপালনের অভ্যাসী হওয়া। শীলপালনের মাধ্যমে মানবোচিত গুণের অধিকারী হওয়া। বিশ্ব মানবসমাজের এক যোগ্য নাগরিক হওয়া সম্ভব হয় একমাত্র বুদ্ধ প্রশংসিত পঞ্চশীলপালনের মাধ্যমে।

এভাবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীলগ্রহণের সুসভ্য সংস্কৃতির পরম্পরা তথাগত বুদ্ধের জীবদ্দশা হতেই শুরু হয়।

পরবর্তী পর্য্যায়ে ত্রিশরণ-গ্রহণ বা গমন বৌদ্ধ ধর্মের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গরূপে গণ্য হয়। শুধু প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রার্থীদেরকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা দান কালেই নয়, অন্য

ধর্মীয় বা সাংঘিক কর্মের প্রাক্কালেও ত্রিশরণগ্রহণকে আবশ্যিক কর্তব্যরূপে মান্যতা দেয়া হয়। এর পরবর্তী পর্য্যায়ে গৃহীদের গার্হস্থ্য ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও ত্রিশরণ-গ্রহণ এক আবশ্যিক ও প্রাথমিক কৃত্যরূপে গৃহীত হয়। গৃহীগণ (উপাসক-উপাসিকা) ত্রিশরণ-গ্রহণের পর তাদের ইচ্ছে ও সুবিধানুসারে পঞ্চশীল, অষ্টশীলাদি নিয়ে থাকেন। ত্রিশরণ-গ্রহণ ছাড়া বৌদ্ধদের দিনচরিয়ার আরম্ভ ও সমাপ্তি হয় না। এটাই বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশের মুখ্য প্রবেশদ্বার বা বীজমন্ত্র। অনেকে ত্রিশরণগ্রহণের মাধ্যমে দিনচরিয়ার সমাপ্তিও ঘটান।

ত্রিরত্ন পরিচয় ও মাহাত্ম্য :

ত্রিরত্নে শরণ-গ্রহণই ত্রিশরণগ্রহণ। 'ত্রিরত্ন' একটি সংস্কৃত-নিষ্ঠ শব্দ। এর পালি রূপ হল 'তি-রতন'। তিন রত্নের সমূহকে 'ত্রি-রত্ন' বলা হয়। এটি একটি সামান্য শব্দ হলেও, বৌদ্ধ ও জৈন (অর্থাৎ পালি ও প্রাকৃত) সাহিত্যে এ শব্দটি একটি বিশেষ অবধারণার অর্থবাহক পারিভাষিক শব্দ। এ 'ত্রি-রত্ন' বস্তুত কি তা জানা থাকা আবশ্যক নয় কি? প্রারম্ভিক পালি সাহিত্যের ভিত্তিতে তার সামান্য পরিচয় প্রদানের এক সামান্য প্রয়াস এখানে করা হল।

সংসারে অনেক প্রকারের 'রত্নে'র নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- সপ্তরত্ন, নবরত্ন, দশরত্ন আদি। এখানে দশরত্নের নামোল্লেখ করা হল। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত দশটি রত্ন প্রমুখ-

(১) মুক্তা, (২) মণি, (৩) বৈদূর্য্য, (৪) শঙ্খ, (৫) শিলা, (৬) প্রবাল, (৭) রৌপ্য, (৮) সুবর্ণ, (৯) লোহিত, (১০) কবরমণি। একত্রে এদের দশরত্ন বলা হয়।

(পারাজিকাকণ্ডো, বিমতিবিনোদনী টীকা)

এসবকে 'রত্ন' বলা হয় কেন? এদের মধ্যে বিদ্যমান দ্রব্যগুণের কারণে এসবকে 'রত্ন'-রূপে অভিহিত করা হয়। সংসারে অস্তিত্ববান ও দৃশ্যমান সব তত্ত্বই অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুরশীল। তবে এমন কিছু বস্তু বা তত্ত্ব রয়েছে যার বা যাদের দ্রব্যগুণের স্থায়ীত্ব অন্য বস্তু বা তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী, কিছু এমন তত্ত্বও রয়েছে যাকে শত যত্নে রাখা হলেও ক্ষণভঙ্গুরধর্মীতার কারণে তা তার স্বভাবজাত গুণ হারিয়ে ফেলে। আবার এমন কিছু তত্ত্ব রয়েছে যার দ্রব্যগুণকে অধিকাধিক আরক্ষাবরণ বা যত্ন দিয়ে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘ-স্থায়ী করা যায়। আবার এমনও কিছু দুর্লভ তত্ত্ব রয়েছে যাকে অযত্নে ফেলে রাখা হলে তার আকার প্রকারে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও গুণগতদৃষ্টিতে কিন্তু তা গুণহীন হয়ে পড়ে না। যেমন উদাহরণস্বরূপ মণি-মুক্তা-হীরের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হীরেকে সমুদ্রের বা ভূ-গর্ভের অতল তলে সুদীর্ঘকাল সযত্নে লুকিয়ে বা অযত্নে ফেলে রাখলেও তা তার স্বভাবজাত দ্রব্যগুণ হারায় না। পুনরাবিস্কৃত হওয়া মাত্রই মানবসমাজে তার মূল্যাংকন হয়। তার মর্য্যাদা সে পুনরায় ফিরে পায়।

শুধু তা নয়, অচেতনদ্রব্য হয়েও চেতনশীল প্রাণীকে বিপদ-রহিত রাখার ব্যাপারে এমন রত্ন বা রত্নসমূহ নানা ভাবে উপকারী সিদ্ধ হয়। মান, সম্মান, যশ, খ্যাতি-কীর্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি দানেও এ সব রত্ন মানুষকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করে। এ ছাড়াও অধিকাধিক পারিবারিক ও জাগতিক ভোগ-সম্পত্তি লাভের উদ্দেশ্যে এ সবের প্রয়োগের উল্লেখ পৌরাণিক ও আধুনিক উভয় সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। এ কারণে অধিকাধিক রত্নের অধিকারী হবার এক সুপ্ত বাসনা প্রায় সব মানুষেরই রয়েছে। এর পূর্তির প্রয়াসে সে প্রতিস্পর্ধারও পাত্র হয়। নিজের আয়ত্তাধীনে এনেও সে ক্ষান্ত হয় না। কালে কালান্তরে সার্বজনিকভাবে প্রদর্শন করার ও অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের বা অপরকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে ঐ সব রত্নকে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও ধারণ করে।

এমন রত্নকে আয়ত্তাধীনে আনার প্রয়াসে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে হানাহানি ও কাড়াকাড়ি, এমন কি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেরও সৃষ্টি হয়।

এসব রত্নসমূহের একটি বিশেষত্ব, কার কাছ হতে আনা হল বা কিভাবে ছিনিয়ে আনা হল এসব বাদবিচার এদের নেই। এদের একমাত্র কাজ হল, - যে বা যারা এদের ধারণ করে অথবা এরা যার বা যাদের আয়ত্তাধীনে থাকে তাকে বা তাদেরকেই রক্ষা করা। এ কারণে প্রায়ই সবল ও বুদ্ধিমানী ব্যক্তিরাই এদের করায়ত্ত করে থাকে।

এদের 'রত্ন' বলার কারণ সম্পর্কে পালিসাহিত্যে উপলব্ধ নিম্নলিখিত গাথা এখানে উল্লেখনীয় ---

"চিত্তীকতং মহগ্ঘঞ্চ, অতুলং দুল্লভদস্সনং,
অনোমসত্তপরিভোগং, রতনং তেন বুচ্চতি।"

(মহাবগ্গ-অট্ঠকথা)

সৌন্দর্য্যে নয়নাভিরাম ও মনোরম হওয়ায়, মূল্যে মহার্ঘ্য হওয়ায়, সহজলভ্য না হওয়ায়, অপরিসীম ভোগ-সম্পত্তি-দানে সহায়ক বা সমর্থ হওয়ায় এদেরকে 'রত্ন' বলা হয়। এ ছাড়া ধারক বা বাহকের মনে সতত 'রতি'-বর্দ্ধনে সমর্থ হওয়ায়ও এদের 'রত্ন' বলা হয়।

শুধু মাত্র অচেতন ও ভৌতিক দ্রব্যকে রত্ন বলা হয়, তা নয়। চেতনশীল প্রাণীকেও অনেক সময় "রত্ন'রূপে ভূষিত করা হয়। পালি সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনাবলী হতে জানা যায় সিদ্ধার্থের জীবনকে লক্ষ্যাভিমুখী করে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর সহায়করূপে সাতপ্রকারের রত্নের আবির্ভাব হয়েছিল। ঐ সাতটি রত্ন হল ---

(১) চক্ররত্ন, (২) হস্তিরত্ন, (৩) অশ্বরত্ন, (৪) মণিরত্ন, (৫) স্ত্রীরত্ন, (৬) গৃহপতিরত্ন ও (৭) পরিণায়করত্ন।

ব্রহ্মায়ুসুত্ত, মজ্ঝিমনিকায়-২

এসবের বিশ্লেষণ হতে এ কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে যা, যে বা যারা ভরসার যোগ্য আর প্রাণীর আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও প্রজ্ঞার বর্দ্ধনে সহায়ক হয় তা মানবসমাজে 'রত্ন' বা 'রত্নতুল্য'-রূপে গৃহীত ও সমাদৃত হয়।

ত্রিশরণগমনের বিধি :

এমন মহার্ঘ্য ত্রিরত্নের শরণ-গ্রহণই ত্রিশরণগমন। ত্রিশরণগমনের এক সুনিশ্চিত বিধি রয়েছে। শাস্তা নির্দেশিত ত্রিশরণগমনবিধি এরূপ ---

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।।"

এ তিনটি বাক্য পালি ভাষায় লিখিত। এর সংস্কৃত রূপ হল ---

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

উপরোক্ত তিনটি পালি বা সংস্কৃত বাক্যের অর্থ হল ---

(আমি) বুদ্ধের (শরণাপন্ন হলাম) শরণগ্রহণ করছি।
(আমি) ধর্মের (শরণাপন্ন হলাম) শরণগ্রহণ করছি।
(আমি) সংঘের (শরণাপন্ন হলাম) শরণগ্রহণ করছি।

মানুষ তিনটি উপায়ে (দ্বারে) তার অভীষ্ট বা অনভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে। কায়দ্বার, বচীদ্বার, ও মনোদ্বারাদি ভেদে কর্মও তিন প্রকারের যেমন - কায়দ্বারে কৃত (কায়-) কর্ম, বচীদ্বারে কৃত (বচী/বাণী-) কর্ম ও মনোদ্বারে কৃত (মনো-) কর্ম । উপরোক্ত তিনটি দ্বারে তাল মিলিয়ে (সামঞ্জস্য রক্ষা

করে) কোন কর্ম করা হলে সে কর্ম সুসম্পাদিত হয়। সশক্ত হয়। পাপ-কর্ম করা হলে তা তিনটি দ্বারকে অপরিশুদ্ধ করে; দুষ্পরিণামদায়ক হয় আর পরিণামে তা দুঃখ দেয়। পুণ্য-কর্ম করা হলে তা পরিশুদ্ধ হয়। তা সুফলদায়কও হয়। পরিপূর্ণতাও প্রদান করে।

ত্রিশরণগ্রহণ বা গমনও একটি কর্ম। তদুপরি এটি একটি পুণ্যকর্ম। এ কর্মের পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে একে পরিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করতে হয়। পরিশুদ্ধভাবে করতে হলে ত্রিশরণগ্রহণজনিত কর্মকে কায়-বাক্য-মন ত্রিবিধ উপায়ে বা দ্বারেই পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়।

কেবল মনে মনে এ বাক্যগুলোকে আওড়িয়ে মনোকর্ম সম্পাদন করলেই (ত্রিশরণগমন) কার্য্য শুদ্ধ হয় না। এ-গুলোকে কেবল শুদ্ধভাবে (মুখদ্বারে) উচ্চারণ করলেই এ ত্রিশরণগমনকার্য্য পূর্ণত শুদ্ধ হয় না। শারীরিক মুদ্রায়ও শরণযাচনার ভাব ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধ বা তাঁর প্রতিমা বা চিত্রকে, ধর্মকে (ধর্মের প্রতীক বা সূচক যে কোন পূজার্হ বস্তুকে) এবং সংঘকে (পবিত্র ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘ বা সংঘের প্রতিনিধি আদর্শ পুরুষ) সাক্ষীরূপে মেনে নিয়ে সম্মানসূচক অঞ্জলি (কর) বদ্ধহাতে মাটিতে হাটু স্পর্শ করে (উৎকুটিক মুদ্রায়) বিনয়সম্মত নীচু আসনে পঞ্চাঙ্গে বা ষষ্টাঙ্গে বা প্রণাম জানিয়ে উপরোক্ত ত্রিশরণগমনসূচক বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে হয়। স্বপ্নে বা অর্দ্ধচেতন বা অজ্ঞানে বা পাগলের বা মদাসক্তের প্রলাপ বকার বা পুনরাবৃত্তি করার ন্যায় বিরক্তি বা অশ্রদ্ধাসূচক

সুরে এ সব আওড়ালে ত্রিশরণগমন শুদ্ধ হয় না। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একাগ্রচিত্তে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় ও শ্রদ্ধাসহকারে তা উচ্চারণ করতে হয়। একবার উচ্চারণ করলেও তা অপরিশুদ্ধ ও অপরিপূর্ণ হয়। তা ক্রমান্বয়ে তিনবার উচ্চারণ করতে হয়। একাধিক ক্ষেত্রে অযাচিতভাবে ত্রিশরণ-দানের দুষ্পরিণাম পরিলক্ষিত হওয়ায় অযাচিতভাবে কাউকে কোথাও ত্রিশরণদান বা ধর্মোপদেশ দান করা দোষনীয় ও বর্জনীয় কৃত্যরূপে বিনয়পিটকে চর্চিত হয়েছে। এ কারণে ত্রিশরণগ্রহণের পূর্বে ত্রিশরণ-দানের যাচনা (প্রার্থনা) করার বিধি শাস্তা কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে। ত্রিশরণ-দানের যাচনা এরূপ ----

"ওকাস অহং, ভন্তে, তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে, ভন্তে।"

[৩ বার]

[(পূজ্য) ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। ত্রিশরণ সহ ধর্মানুকুল পঞ্চশীল প্রদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে, ভন্তে, আমায় শীল প্রদান করুন।]

এভাবে ক্রমান্বয়ে তিনবার প্রার্থনা করার মাধ্যমে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ত্রিশরণগমনজনিত পুণ্যপ্রার্থী ও পুণ্যকর্মে ব্রতী হবার সামাজিকতা ও ব্যবহারিকতা পূর্ণ করতে হয়। তা না হলে ত্রিশরণগমনকার্য্য অশুদ্ধ ও অপূর্ণ হয়।

এভাবে ত্রিশরণপ্রদানের যাচনা করা হলে সংঘের প্রতিনিধি সদস্য (ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী বা অভিজ্ঞ শ্রামণের বা শ্রামণেরী)

পঞ্চশীলযাচককে (ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহ) পঞ্চশীল প্রদান করেন। পঞ্চশীলপ্রদানকারী নিম্নলিখিত বিধিতে পঞ্চশীল প্রদান করে বলবেন -----

"যমহং (যং অহং) বদামি তং বদেহি / বদেথ।"

[আমি যা বলছি তা বল (তা বলুন বা আবৃত্তি করুন)।]

শীলযাচক উত্তরে বলবেন --- ***"আম, ভন্তে।"***

[হ্যাঁ, ভন্তে] (অর্থাৎ আপনি যা বলবেন আমিও তা বলব।]

ভন্তে, বলবেন ----

"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।"

(সক্কপঞ্হসুত্ত-মহাবগ্গ)

[ঐ সম্যক্ সম্বুদ্ধ অর্হৎ ভগবানকে নমস্কার (করি)।]

শীলযাচক বলবেন -----

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

[৩ বার]

ভন্তে বলবেন -----

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(প্রথম শীল)

[প্রাণীহত্যাজনিত (পাপকর্ম) হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করছি।]

শীলযাচক বলবেন ----

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

ভন্তে বলবেন ----

অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(দ্বিতীয় শীল)

[অপ্রদত্ত বস্তু গ্রহণ (চুরি) না করার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করছি।]

শীলযাচক বলবেন -----

অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

ভন্তে বলবেন -----

কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(তৃতীয় শীল)

[মিথ্যা কামাচার - ব্যাভিচারজনিত পাপকর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করছি।]

শীলযাচক বলবেন -----

কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

ভন্তে বলবেন -----

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(চতুর্থ শীল)

[মিথ্যা কথা বলা জনিত (পাপ) কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করছি।]

শীলযাচক বলবেন -----

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

ভন্তে বলবেন ----

সুরামেরেয়মজ্জপ্পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

(পঞ্চম শীল)

[সুরামৈর্য্যাদিমাদক (তরল বা কঠিন) দ্রব্যাদি সেবন এবং প্রমাদকর স্থানে গমনজনিত (পাপ) কর্ম হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ পালন করার সংকল্প গ্রহণ করছি।]

শীলযাচক বলবেন -----

সুরামেরেয়মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

এভাবে পঞ্চশীল [আত্ম সংযমের পাঁচটি ব্রত বা সংকল্প] প্রদান ও গ্রহণের কার্য্য সম্পাদন শেষে পঞ্চশীল প্রদানকারী ভন্তে নিম্নোক্ত অনুশাসন বাক্য বলবেন ----

"সাধু, সাধু, সাধু। ইমং তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।"

[বেশ, বেশ, বেশ। এ ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল-ধর্মকে প্রমাদরহিত হয়ে (স্মৃতির সাথে) পালন কর।]

অথবা বা তিনি বলবেন -----

"সাধু, সাধু, সাধু। সীলেন সুগতিং যন্তি, সীলেন ভোগসম্পদা, সীলেন নিব্বুতিং যন্তি। তস্মা সীলং বিসোধয়ে।"

[বেশ, বেশ, বেশ! শীল-পালনের মাধ্যমে সুগতি প্রাপ্তি হয়, শীল-পালনের মাধ্যমে ভোগসম্পত্তি বাড়ে, শীল-পালনের মাধ্যমে নির্বাণ প্রাপ্তিও ঘটে। কাজেই (একথা মনে রেখে) শীল বিশোধন কর।]

শীলগ্রাহক বলবেন ---- ***"আম, ভন্তে"*** [হ্যাঁ, ভন্তে।]

এর পর পঞ্চশীলপ্রদানকারী উপস্থিত প্রতিনিধি ভিক্ষু বা ভিক্ষু-সংঘ পঞ্চশীলগ্রহণকারী উপাসক / উপাসিকার (সমূহের) মঙ্গলকামনা করে পরিস্থিতি ও কালানুকুল পরিত্রাণসূত্রাদির পাঠ করেন। পরিত্রাণসূত্রপাঠের পর জীবিত বা মৃত (পরলোকগত) সকল প্রাণীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় পুণ্যদানসূচক জল ঢেলে পুণ্যদানের মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়।

ত্রিশরণগ্রহণের উদ্দেশ্য :

ত্রিরত্নে (বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন ও সংঘরত্ন) অচলা ও অটলা শ্রদ্ধা ব্যক্ত করা ও শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধন করাই ত্রিশরণগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এর মাধ্যমে ত্রিশরণগ্রহণকারীর জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য দুই'ই মুখরিত হয়। শরণসমূহের মধ্যে 'ত্রিশরণ'ই শ্রেষ্ঠ

শরণ। এমন আস্থা নিয়ে শরণগ্রহণ করা হলে সে শরণগ্রহণ শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয়। কোন কারণে ত্রিরত্ন ও ত্রিশরণ-এর কোন একটিতে সন্দেহ উৎপন্ন হলে বা শংকাযুক্ত মনে 'ত্রিশরণ' নেয়া হলে সে শরণগ্রহণ অশুদ্ধ হয়। কাজেই শরণগ্রহণকে ছেলেখেলারূপে গ্রহণ করা মোটেই উচিত নয়। ত্রিশরণগ্রহণকে কেবল পাগলের প্রলাপ বা ভাড়াটে আবৃত্তিকারীর বা নাটকের পাত্র-পাত্রীর ন্যায় শব্দোচ্চারণমাত্ররূপে গ্রহণ করাও উচিত নয়। এ পবিত্র প্রক্রিয়ার সাথে ব্যক্তির আস্থা ও সমগ্র সত্ত্বার এক নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। আবার এর সাথে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে।

শরণগ্রহণভেদ :

আদর্শ, উদ্দেশ্য ও আস্থা (শ্রদ্ধা) ভেদে শরণ গ্রহণ দু প্রকারের -

(১) লৌকিক-শরণগমন, ও (২) লোকোত্তর-শরণগমন।

পভেদতো পন দুবিধং সরণগমনং - লোকিয়ং লোকুত্তরঞ্চ। তত্থ লোকুত্তরং দিট্ঠসচ্চানং মগ্গক্খণে সরণগমনুপক্কিলেসসমুচ্ছেদেন আরম্মণতো নিব্বাণারম্মণতো দুত্বা কিচ্চতো সকলে পি রতনত্তয়ে ইজ্ঝতি; লোকিয়ং পুথুজ্জনানং সরণগমনুপক্কিলেসবিক্খম্ভনেন আরম্মণতো বুদ্ধাদি আরম্মণং হুত্বা ইজ্ঝতি।

পুত্তসুত্তবণ্ণনা-খুদ্দকনিকায়

লৌকিক শরণ-গমন : লৌকিক বা বৈষয়িক লক্ষ্য পূর্তির উদ্দেশ্যে শরণগমন বা গ্রহণ করা হলে ঐ শরণগ্রহণকে

লৌকিক শরণ গ্রহণ বা গমন বলা হয়। সাধারণ (পৃথগ্‌জন বা অনার্য্য) জনের হৃদয়ে ত্রিরত্নের প্রতি অচলা অটলা শ্রদ্ধা না থাকায় তাদের ত্রিশরণগ্রহণ চির (দীর্ঘ) স্থায়ী হয় না। এ শ্রেণীর প্রাণীর, বিশেষত মানুষ, সামান্য লাভের আশায় ত্রিশরণাপন্ন হন। পঞ্চমুখে ত্রিরত্নের গুণগাথা কীর্তন করেন। কিন্তু আশানুরূপ অভিলাষা পূর্তি না হলে ত্রিরত্নের স্থলে অন্যের গুণকীর্তন করা শুরু করে। ত্রিশরণ শ্রেষ্ঠ শরণ না হয়ে তদপেক্ষা হীন শরণই তাদের কাছে অজ্ঞতাবশতঃ শ্রেষ্ঠ শরণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজ নিজ কর্মবিপাকে এমন শরণের শরণাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আশা ও অভিলাষার অপূর্তি হতে দেখে আবার নতুন শরণের শরণাপন্ন হন। এমন অবস্থায় তারা নতুন শরণস্থলের প্রশংসায় ক্ষান্ত হন না। এভাবে লোভ, দ্বেষ ও মোহের কারণে তাদের শরণ খণ্ডিত হয়। পৃথগ্‌জনদের উপক্লেষাদির উপশমের উদ্দেশ্যে বুদ্ধাদির গুণারম্মণকে ভিত্তি করে শরণ-গ্রহণ করাকে লৌকিকশরণ বলা হয়।

লোকোত্তর শরণগমন :

মার্গপ্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষগণের উপক্লেষাদির সমুৎচ্ছিন্ন করার পর নির্বাণালম্বনকে ভিত্তি করে নেয়া শরণগ্রহণকে লোকোত্তর শরণ-গ্রহণ বলা হয়। লোকোত্তর শরণ আবার চার প্রকারের। যেমন --- (১) স্রোতাপন্ন-শরণ, (২) সকৃদাগামী-শরণ, (৩) অনাগামী-শরণ, ও (৪) অর্হৎ-শরণ।

এমন পুরুষগণ এক বার যার শরণ গ্রহণ করেন তার আর শরণ-পরিবর্তন হয় না। আমরণ ওতেই শরণাপন্ন থাকেন। তাদের হৃদয়ে ত্রি-রত্নের প্রতি অচলা অটলা ভক্তি ও আস্থা থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা তাকে ত্রি-শরণগমন হতে চ্যুত করতে পারে। এমন আর্য্যপুরুষগণের শরণগমন কখনও কোন কারণে খণ্ডিত হয় না। তা অখণ্ড থাকে। এমন শরণগ্রহণই সর্বোত্তম শরণগ্রহণ বলা হয়।

এমন আর্য্যপুরুষগণের ত্রিশরণগমনকে পুনরায় তাদের শ্রদ্ধাভেদে শৈক্ষ্যশরণ-গ্রহণ ও অশৈক্ষ্যশরণ-গ্রহণ দু শ্রেণীতে বিভক্ত করারও প্রচলন রয়েছে।

নির্বাণের পথে প্রগতিশীল আর্য্য পুরুষগণ আধ্যাত্মিক উন্নততর অবস্থার প্রাপ্তি (সংযোজন-ধর্মসমূহের ক্রম বিনাশ) ভেদে চার শ্রেণীর হয়ে থাকেন। যেমন ---

১। স্রোতাপন্ন আর্য্য পুরুষ,

২। সকৃদাগামী আর্য্য পুরুষ,

৩। অনাগামী আর্য্য পুরুষ,

৪। অরহন্ত আর্য্য পুরুষ।

আবার 'মার্গ' ও 'ফল' ভেদে তাঁরা মূলত আট প্রকারের হয়ে থাকেন। যেমন ---

১। স্রোতাপন্ন-মার্গ-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

২। স্রোতাপন্ন-ফল-প্রতিপন্ন আর্য্য পুরুষ।

৩। সকৃদাগামী-মার্গ-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

৪। সকৃদাগামী-ফল-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

৫। অনাগামী-মার্গ-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

৬। অনাগামী-ফল-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

৭। অরহন্ত-মার্গ-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

৮। অরহন্ত-ফল-প্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ।

শাস্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সংঘ' দু প্রকারের ***(সঙ্ঘো দ্বিবিধুত্তমং)*** 'সংবৃতি সংঘ' ***(সম্মুতি-সংঘ)*** ও পরমার্থ সংঘ ***(পরমত্থ-সংঘ)***। 'প্রবজ্যা' ও 'উপসম্পদা' দান বা গ্রহনের মাধ্যমে যে (ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী) 'সংঘের' সৃষ্টি হয় তাকে 'সংবৃতি সংঘ' বলা হয়। এরা অনাগারিক (গার্হস্থ্য জীবন বর্জন করে) ব্রহ্মচর্য্য জীবন যাপন করে থাকেন। তাঁরা গৈরিক অরহতধ্বজা (কষায় বস্ত্র বা চীবর) ধারণ করেন।

নির্বাণগামিনী প্রতিপদায় আরূঢ় আর্য্যপুরুষের সমূহকে পরমার্থ-সংঘ বলা হয়। এদেরকে কখনও বা প্রথমোক্ত চার শ্রেণীতে, আবার কখনও বা শেষোক্ত আট শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এ ধরণের শ্রেণীবিভাজনের উল্লেখ শাস্তা তাঁর দেশনায় সংঘের গুণগাথা শোনানোর সময় করেছেন। যেমন ---

"যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠ পুরিসপুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসংঘো।" এ শ্রাবক-সংঘের প্রশংসায় রত্নসূত্রে (রতনসুত্তে) তাঁকে বলতে পাই ----

"যে পুগ্গলা অট্ঠসতং পসত্থা,
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।"

(রতনসুত্ত-খুদ্দকপাঠ)

শেষোক্ত আট শ্রেণীর প্রথম সাত শ্রেণীভুক্ত আর্য্য পুরুষগণের জীবনে প্রাপ্তব্য বা শিক্ষণীয় কিছু থাকে, এ কারণে এমন আর্য্য পুরুষ বা পুরুষগণের সমূহকে শৈক্ষ্য আর্য্যপুরুষরূপে বিশেষিত করা হয়। শেষোক্ত আট শ্রেণীর অন্তিম অরহন্তফলপ্রতিপন্ন আর্য্যপুরুষ-সমূহ 'অশৈক্ষ্য আর্য্যপুরুষ'-রূপে জানা যায়, কারণ এদের জীবনে কিছুই অতৃপ্ত এবং কিছুই শিক্ষণীয় থাকে না।

এমন শৈক্ষ্য আর্য্য পুরুষের শরণ-গ্রহণকে 'শৈক্ষ্য শরণগ্রহণ' আর অশৈক্ষ্য আর্য্য পুরুষের শরণ-গ্রহণকে 'অশৈক্ষ্য শরণ-গ্রহণ' বলা হয়।

শরণ-গ্রহণ আবার অন্য চার প্রকারেরও হয়। যেমন- (১) আত্মসমর্পণ শরণ, (২) তৎপরায়ণ শরণ, (৩) শিষ্যত্ব গ্রহণ-শরণ, ও (৪) প্রণিপাত শরণ।

তয়িদং চতুধা পবত্ততি- অত্তসন্নিয্যাতনেন, তপ্পরায়ণতায়, সিস্সভাবুপগমনেন, পণিপাতেনাতি। তত্থ অত্তসন্নিয্যাতনং নাম 'অজ্জ আদিং কত্বা অহং অত্তানং বুদ্ধস্স নিয্যাতেম্মি, ধম্মস্স, সংঘস্সা' এবং বুদ্ধাদীনং অত্তপরিচ্চজনং। তপ্পরায়তনং নাম 'অজ্জ আদিং কত্বা অহং বুদ্ধপরায়ণো,

ধম্মপরায়ণো, সংঘপরায়ণো ইতি মং ধারেহীতি এবং তপ্পটিসরণভাবো তপ্পরায়ণতো। সিস্সভাবুপগমনং নাম 'অজ্জ আদিং কত্বা অহং বুদ্ধস্স অন্তেবাসিকো, ধম্মস্স, সংঘস্স ইতি মং ধারেতু'তি এবং সিস্সভাবস্স উপগমনং। পণিপাতো নাম 'অজ্জ আদিং কত্বা অহং অভিবাদনপচ্চুপট্ঠান অঞ্জলি কম্মসামীচিকম্মং বুদ্ধাদীনং এব তিণ্ণং বত্থুনং করোমি ইতি মং ধারেতুতি এবং বুদ্ধাদীসু পরমনিপচ্চকারো।

(১) আত্ম-সমর্পণ শরণ : শরণপ্রার্থীদের কেহ শরণগ্রহণকালে শরণগ্রহণের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন --- "আজ হতে আমি নিজেকে ত্রিরত্নের নামে উৎসর্গীকৃত (আত্ম-সমর্পণ) করলাম।" তারা অনেক সময় এমনও বলে থাকেন- "ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার দেহ পরিত্যাগ করছি। আজীবন অর্থাৎ আমরণ আমি তাঁর শরণে (শরণাপন্ন) থাকব।" প্রারম্ভিক পালি সাহিত্যে এমন শ্রেণীর শরণার্থীকে বলতে পাই --- *"এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্খু-সংঘঞ্চ; উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গত'ন্তি।"*

"এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেকপরিয়ায়েন ধম্মো পকাসিতে, এসা'হং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্খুসংঘঞ্চ। উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু, অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গত'ন্তি।"

(আলবকসুত্ত/মজ্ঝিমনিকায়)

[এ আমি ভগবান গৌতম বুদ্ধের, তাঁর ধর্ম, ও সংঘের শরণ গ্রহণ করছি। আমাকে আজ হতে আমরণ (শরীর হতে প্রাণ যাওয়া অবধি) আপনার মান্য গৌতমের শরণাপন্ন উপাসকরূপে গ্রহণ করুন। এমন শরণ-গ্রহণকে আত্মত্যাগশরণগ্রহণ ***(অত্তসন্নিয়্যাতনেন)*** বলা হয়।

(২) তৎপরায়ণ-শরণ : শরণপ্রার্থীগণের কেহ তাদের শরণ যাচনা কালে বলে থাকেন - "আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘপরায়ণ হলাম। আমি তাঁদেরকে (ত্রিরত্নকে) শ্রেষ্ঠ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করছি। আজ হতে, (ভন্তে/ভগবান) আমাকে ত্রিরত্নপরায়ণরূপে (তদ্গত) বলে মনে (স্বীকার) করুন। এ ধরণের শরণগ্রহণকে তৎপরায়ণ-শরণগ্রহণ ***(তপ্পরায়ণতায়)*** বলা হয়।

(৩) শিষ্যত্ব-গ্রহণ শরণ : শরণপ্রার্থীদের কেহ শরণ যাচনা কালে এ মনোভাব ব্যক্ত করেন -- "আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শিষ্য হলাম। আমায় শিষ্যরূপে ধারণ করুন।" যেমন মহাশ্রাবক মহাকাশ্যপাদিগণ গ্রহণ করেছিলেন। আজ হতে আমি বুদ্ধের শিষ্য হলাম; ধর্মের শিষ্য হলাম আর সংঘের শিষ্য হলাম। আমাকে শরণাগত শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। এভাবে শরণগ্রহণের ভাবকে শিষ্যত্ব-গ্রহণ শিষ্য-ভাব-উপগমন-শরণ ***(সিস্সভাবুপগমনেন)*** বলা হয়।

(৪) *প্রণিপাত শরণ :* শরণপ্রার্থীদের কেহ আবার এ বলে শরণগ্রহণ করেন --- "আজ হতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম, ও

সংঘকেই প্রণিপাত ও সেবাশুশ্রূষাদি করব। আমাকে আপনাদের দায়ক ও সেবকরূপে ধারণা করুন।" অথবা বলে থাকেন "আজ হতে ত্রিরত্নকে (মান, সম্মান, অভিনন্দন, অভিবাদন ও পূজা করব। আমাকে ত্রিরত্নপূজক বলে গ্রহণ করুন।" যেমন মহাব্রহ্মাদিগণ গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে অত্যধিক শ্রদ্ধাপ্লুত ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে শরণ-গ্রহণ করাকে প্রণিপাতশরণ ***(পণিপাতেন)*** বলা হয়।

বুদ্ধবাদে কর্মবাদ :

প্রাণীর শ্রেণীভেদ ও জীবন স্তরের বিবিধতার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা কালে সংক্ষেপে বুদ্ধের যে কর্মবাদকে তুলে ধরা হয়েছে তা এখানে একটু বিষদ্ভাবে বর্ণিত হবে। প্রাণীগণের এ ভেদ-বৈষম্য চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই বিচলিত করে। এ চিন্তা অনেককে গৃহত্যাগী করেছে আর জ্ঞানান্বেষীও করেছে। আবার অনেককে জ্ঞানী বা মহাপুরুষও বানিয়েছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থকেও এ চিন্তাই গৃহত্যাগী করে প্রবুদ্ধ বানিয়েছে। একবার বারাণসীর এক স্বনামধন্য তোদেয়্য শ্রেষ্ঠীর পুত্র মাণবক শুভও এ চিন্তায় চিন্তিত হয়েছিলেন ---

প্রাণীতে প্রাণীতে এত ভেদ কেন? কেহ ছোট, কেহ বড়; কেহ ধনী, আর কেহ নির্ধন; কেহ সুন্দর, আর কেহ কুরূপধারী; কেহ সুস্থ আর কেহ দুঃস্থ, কেহ মুর্খ আর কেহ জ্ঞানী; কেহ সুখী আর কেহ দুঃখী; কেহ দীর্ঘায়ু সম্পন্ন

আর কেহ অল্পায়ু সম্পন্ন; কেহ রাজা আর কেহ প্রজা; কেহ মানুষ আর কেহ অমানুষ, কেহ অপার যশের আর কেহ অপার নিন্দার অধিকারী, কেহ হেয় আর কেহ মান্য; কেহ শত্রু আর কেহ মিত্র; কেহ নর আর কেহ নারী; আবার কেহ নপুংসক, কেন এত বিভেদ? কে এ বিভেদের কারণ? সে কি সেই তথাকথিত ঈশ্বর, না আর কেহ? প্রাণীর শ্রেণীভেদের যেন শেষ নেই। প্রশ্ন মাত্র একটি। কিন্তু এই একটি প্রশ্ন তাঁকে মাতিয়ে তুলেছে অনেক। এই প্রশ্নই তাকে কত মুনি ঋষির কাছে নিয়ে গেছে। নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করেছেন এ প্রশ্নের উত্তরে। এত উত্তর পেয়েও সে যেন সন্তুষ্ট নয়। মন যেন তাঁর আরও বেশী আলোড়িত হত। কে এর সুসমাধান দিতে পারবে? অবিরাম খোঁজ নিতে থাকে সে। লোকমুখে ভগবান বুদ্ধের যশ-খ্যাতির কথা শুনতে পান। আরও জানতে পারেন- সব প্রশ্নের সুসমাধান তিনি দিতে পারেন। জন-সাধারণ একথাও তাকে জানিয়ে দেয় গৌতম বুদ্ধ কেবল মানবের শাস্তা (শিক্ষক) নন। তিনি দেব-মানব-ব্রহ্মারও অতুলনীয় শাস্তা। মাণবক শুভ শাস্তার খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন - সেই শাস্তা শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন। আর কালবিলম্ব না করে ছুটে চললেন - শাস্তার দর্শনে শ্রাবস্তীর পানে। শ্রাবস্তীবাসীর মুখে শুভ জানতে পারেন ---- শাস্তা শ্রাবস্তীরই জেতবনারামে বিহার করছেন। শাস্তার দুর্লভ দর্শন পেয়ে সাদর অভিবাদন জানায় সে। অভিবাদন জানানোর পর শাস্তাকে বিনম্রসুরে জিজ্ঞাসা করেন - "ভন্তে

ভগবান, বিশ্বের প্রাণীসমুহের এত ভেদ-বৈষম্যের মূল কারণ কি?"

শাস্তা অত্যন্ত সহজ ভাবেই এ জটিল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়ে বলেন --

"কম্মস্সকা, মাণবক, সত্তা, কম্মদায়াদা, কম্মযোনী,
কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা, যং কম্মং করিস্সন্তি কল্যাণং
বা পাপকং বা তস্স দায়াদা ভবিস্সন্তীতি।
কম্মং সত্তে বিভজতি যদিদং হীনপ্পণীততায়াতি।"

(চুল্লকম্ম বিভঙ্গ, মজ্ঝিমনিকায়)

[হে মাণবক, কর্মই প্রাণীগণের একান্ত আপনার, প্রাণীগণ কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মই শরণস্থল, প্রাণীগণ তাদের নিজ নিজ কৃত পাপ বা কল্যাণ কর্মের অধিকারী হবে, এ কর্মই প্রাণীগণকে উচু নীচু আদি শ্রেণীতে ভেদ করে ।]

কম্মস্সকা সত্তা :

জন্মক্ষণ হতেই প্রাণীরা আত্মরক্ষার্থে অপরকে (চেতন বা অচেতন তত্ত্ব) আপন (নির্ভরযোগ্য শরণস্থলরূপে গ্রহণ) করার চেষ্টা করে। বস্তুত নিজ কৃত কর্মই প্রাণীর একান্ত আপনার। কর্ম ব্যতীত আর কিছুই কারও আপন হতে পারে না।

কম্মদায়াদা :

প্রাণীরা, বিশেষত মানুষ, আত্মরক্ষা ও আত্মতুষ্টির স্বার্থে নানা রকমের অধিকারের দাবী করে থাকে। মাতৃ ও পিতৃ

কুলের সাত পুরুষের সম্পত্তির অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে বংশধরগণ দাবী করে। কিন্তু প্রায় দেখা যায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য সম্পত্তি হস্তগত হয়েও তা উত্তরাধিকারীর রক্ষা ও তুষ্টি দানে অসমর্থ হয়। আবার অনেক সময় অজানা ও অনভীষ্ট অপার সুখ ও সম্পত্তির আকস্মিক আগমনও মানুষের জীবনে পরিলক্ষিত হয়। এ সব ঘটনার বিশ্লেষণে এ কথাই সিদ্ধ হয় যে প্রাণী প্রকৃতপক্ষে কর্মেরই অধিকারী (দায়াদ)। তাই বলা হয় -

"যাদিসং বপতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং,
কল্যাণকারী কল্যাণং পাপকারী চ পাপকং'
পবুত্তং তাত তে বীজং, ফলং পচ্চনুভোস্সসী'তি।"

(সক্ক-সংযুত্তং-সংযুত্তনিকায়)

[যেমন বীজ বপন করা হয় তেমনি ফল পাওয়া যায়। শুভ কর্মের কর্তা শুভফল আর অশুভকর্মের কর্তা অশুভ ফল পায়। হে তাত, তোমার বীজ (কর্ম) অনুসারে ফল (বিপাক) ভোগ করবে- একথা বলা হয়েছে।]

কম্মযোনি :

যোনি অর্থাৎ প্রাণীর শ্রেণীভেদ, যেমন - প্রেতযোনি, পশুযোনি, মনুষ্যযোনি, দেব-ব্রহ্মযোনি। প্রাণী নানাভেদে বিভক্ত। এদের মধ্যে যোনিভেদ একটি প্রমুখ ভেদ। পুনর্জন্মবাদ মতে মৃত্যুর পর প্রায় প্রাণীরই যোনি পরিবর্তন হয় এ যোনি পরিবর্তন কার নির্দেশে হয়? সুগত তথাগত বুদ্ধের কর্মবাদমতে প্রাণীর যোনি পরিবর্তন কোন অদৃশ্য

ঈশ্বর বা ব্রহ্মার নির্দেশে হয় না। প্রাণীর যোনি পরিবর্তন হয় তার নিজ কৃত কর্মের প্রভাবে। অতীত ও বর্তমান কর্মই ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য বা গন্তব্যস্থল যোনি নির্দ্ধারণ করে। একারণে 'কর্মযোনি' বলা হয়।

কম্মবন্ধু :

জীবনকে সফল, সার্থক, সুন্দর, সুস্থ, সুচালিত, ও সুরক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রাণী, বিশেষত মানুষ, অনেকের সাথে মিতালী (বন্ধুত্ব) পাতায়। তবুও দেখা যায়, অপার আত্মীয়-স্বজন-পরিজন-বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্ত্বেও প্রাণী আপদ-বিপদ-মুক্ত হতে পারে না। আপদ বিপদ রহিত থাকার তার সব প্রয়াস নিজ কৃত কর্ম-দোষে বিফলে যায়। আবার অনেক সময় আপদ-বিপদের পাহাড় প্রমাণ চাপে নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাণী তার নিজের অতীত ও বর্তমান কর্মগুণে আকস্মিকভাবে আপদ-বিপদ হতে মুক্ত হউক হয়। সেখানে দুর্দিনে বা সুদিনে কর্মই ছায়ার ন্যায় প্রাণীর নিত্য সহচর হয়ে থাকে (নিত্য সহচর) কাজেই কর্মই প্রাণীর একান্ত ও প্রকৃত বন্ধু।

কম্মপটিসরণ :

ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রাণী নানা স্থলে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়। সে চায় অধিকাধিক নির্ভরযোগ্য এক শরণস্থল। এ দৃষ্টিতে নিজ কৃত কর্মই সংসারের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য শরণস্থল।

"যং কম্মং করিস্সন্তি কল্যাণং বা পাপকং
তস্স দায়াদা ভবিস্সন্তী' তি।"

(নীবরণ-বগ্গ/অঙ্গুত্তরনিকায়)

প্রাণী তার জীবনে যত রকমের কর্ম করে, সামান্য দৃষ্টিতে তা দু প্রকারের - পাপকর্ম ও কল্যাণ (পুণ্য) কর্ম। প্রাণী নিজ কৃত ঐ পাপ বা কল্যাণ কর্মেরই উত্তরাধিকারী হয়। এমন হয় না যে কেহ পাপকর্ম করে আর সে পুণ্যফল পায়; আবার এমন হয় না যে কেহ শুভকর্ম করে আর সে অশুভফল পায়। অনধিকৃত ভাবে এক প্রাণী অন্যপ্রাণীর কৃত পাপ বা কল্যাণ কর্মের উত্তরাধিকারী হয় না।

"কম্মং সত্তে বিভজ্জতি যদিদং হীনপ্পণীততায়া'তি"

(মজ্ঝিমনিকায়/বিশুদ্ধি-মগ্গ)

প্রাণীর জীবনে পরিলক্ষিত বিবিধ শ্রেণীভেদের মূল কারণ প্রাণীর নিজ কৃত কর্ম। কর্মই তার গতি (দুর্গতি বা সুগতি) নির্ধারণ করে। কর্মই যোনি নির্ধারণ করে। কর্মই প্রাণীর নিয়ন্ত্রক শক্তি। অন্য কথায় বলা যেতে পারে -

"কম্মুনা বত্ততি লোকো কম্মুনা বত্ততে পজা,
কম্মনিবন্ধনা সত্তা রথস্সানী'ব যায়রে।"

(সুত্তনিপাতপালি-৬৫৯)

এ লোক (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) কর্মের দ্বারাই বর্তিত (নিয়ন্ত্রিত) হয়। এর প্রজাগণও কর্মের কারণে বর্তিত (নিয়ন্ত্রিত) হয়। কর্মসূত্রে প্রাণী (প্রজা) আবদ্ধ রয়েছে। রথের চাকার ন্যায় কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় প্রাণীরাও কখন উঁচু (সুগতি)

আর কখন নীচু (দুর্গতি) শ্রেণীতে জন্ম নেয়; অথবা অন্য বিবিধ শ্রেণীতে বিভাজিত হয়।

বীজ বপিত হলে ফল হয় --- এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে এমনও বীজ রয়েছে যা হতে কোন প্রকারের ফল হয় না। আবার এমনও বীজ রয়েছে যা হতে ফল হলেও আশানুরূপ হয় না। আবার এমনও বীজ রয়েছে যা হতে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। তবে ফল অল্প হউক বা অনেক, ফল প্রাপ্তির আশাতেই বীজ বপন করা হয়।

সংসার-চক্র-বর্দ্ধক কর্ম :

প্রাণীর কৃত কর্মও এক প্রকারের বীজ। কর্মরূপী বীজ বপিত (বোয়া) হলে দেহ-মনরূপী এ জীবনে (জমিতে বা বৃক্ষে) পরিণামরূপী ফুল প্রস্ফুটিত হয় এবং ফল ফলে। নৈতিকতার দৃষ্টিতে কর্ম তিন প্রকারের ---
(১) পাপ (অকুশল)-কর্ম, (২) পুণ্য (কুশল)-কর্ম ও (৩) নয় পুণ্য নয় পাপকর্ম।

পাপকর্ম :

নিজের ও পরের অহিতে (সাধনের উদ্দেশ্যে) যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা বুদ্ধমতে (বৌদ্ধ দর্শন মতে) পাপকর্ম। অন্যভাবে বলা যেতে পারে --- যে কর্মের পরিণাম অনুতাপ বা পশ্চাত্তাপের সাথে ভোগ করতে হয় তাও পাপকর্ম। এমন কর্মকে অসৎ বা কালিমাযুক্ত কৃষ্ণ-কর্ম ***(কণ্হ-কম্ম)*** বলা হয়। অভিধর্ম মতে লোভ-দ্বেষ-মোহ জনিত কর্মকে পাপ (অকুশল) কর্ম বলা হয়।

পুণ্যকর্ম :

নিজ ও পরের হিতে (সাধনের উদ্দেশ্যে) যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা তথাগত বুদ্ধমতে (বৌদ্ধ দর্শন মতে) পুণ্যকর্ম। অথবা বলা যেতে পারে --- যে কর্মের পরিণাম অনুতাপ বা পশ্চাত্তাপের সাথে ভোগ করতে হয় তা পুণ্যকর্ম। এমন কর্মকে সৎ কর্ম বা কালিমামুক্ত শুক্ল কর্ম ***(সুক্ক-কম্ম)*** বলা হয়। অভিধর্ম মতে অলোভ-অদ্বেষ-অমোহমূলক কর্মকে পুণ্য (কুশল) কর্ম বলা হয়।

পরিণামের দৃষ্টিতেও কর্ম দু প্রকারের --- (১) দুঃখ (অনুভূতি-) দায়ক কর্ম ও (২) সুখ (অনুভূতি-) দায়ক কর্ম।

দুঃখ-দায়ক কর্ম : যে কর্মের পরিণাম (ফল বা বিপাক) অনুতাপ ও পশ্চাত্তাপের (দুঃখানুভূতির) সাথে ভোগ করতে হয় আর দুর্গতি দান করে তা হল দুঃখদায়ক কর্ম।

সুখ-দায়ক কর্ম :

যে কর্মের পরিণাম (ফল বা বিপাক) কোন প্রকারের অনুতাপ ও পশ্চাত্তাপের সাথে ভোগ করতে হয় না অর্থাৎ যে কর্মের পরিণাম আনন্দ (সুখানুভূতির) দায়ক বা বর্দ্ধক হয় আর সুগতিপ্রদান করে তা হল সুখদায়ক কর্ম।

কর্ম ও বিপাকের অন্তর্নিহিত প্রতীত্যসমুৎপন্ন সম্বন্ধের বিশ্লেষণ হতে জ্ঞানীজন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন - পাপকর্ম সদাসর্বদা দুঃখদায়ক ও দুঃখবর্দ্ধক হয়। আর এর

বিপরীত পুণ্যকর্ম সব সময়ই সুখদায়ক ও সুখবর্দ্ধক হয়। কর্ম সে পাপময় হউক বা পুণ্যময়, বিপাকদায়ী হওয়ায়, তা জন্মদায়ক হয়। ফলত তা সংসার-চক্র-বর্দ্ধক হয়।

সংসার-চক্র-নিরোধক কর্ম :

পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম বাদে প্রাণী আরেক শ্রেণীর যে কর্ম করে থাকে তা হল "নয় পাপ আর নয় পুণ্য কর্ম" এমন কর্ম করা কালে প্রাণীর মন লোভ-দ্বেষ-মোহ আর অলোভ-অদ্বেষ-অমোহাদি হেতুমুক্ত থাকে। এমন কর্মকে অভিধর্মের ভাষায় 'অহেতুক কর্ম' বলা হয়। অহেতুক কর্ম কোন প্রকারের বিপাক (ফল) দান করে না। বিপাকহীন হওয়ায় এমন কর্ম পুনর্জন্ম দেওয়াতে অসমর্থ থাকে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে এমন কর্মের মধ্যে পুনর্জন্ম দেবার বীজ থাকে না। এভাবে এমন (নেব কহু নেব সুক্ক) কর্ম সংসার-চক্র-নিরোধক হয়।

পাপকর্মের দুষ্পরিণাম

বিশেষত মানুষ, অজ্ঞতাবশত পাপকর্মে লিপ্ত হয়। কর্মসম্পাদনের মধ্যভাগে অথবা সম্পাদন শেষে পাপ (কু) কর্মের আসন্ন বা সম্ভাব্য দুষ্পরিণামের কথা চিন্তা করে দুষ্পরিণাম হতে বাঁচার (আত্মরক্ষার) উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারের শরণের শরণাপন্ন হয়। ঐ সব শরণের বিষদ্ বর্ণনা দেয়া এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে দেব-ব্রহ্মা-মানবের অনুপম শিক্ষক (শাস্তা) তাঁর উপদিষ্ট নিম্নোক্ত গাথায় তা বড়ই দক্ষতার সাথে বলে দিয়েছেন ---

"বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ,
আরামরুক্খচেত্যানি মনুস্সা ভয়তজ্জিতা।"

(ধম্মপদ/গাথা-১৮৮)

[মানুষ ভয়ে ত্রাস্ত হয়ে (আত্মরক্ষার্থে) বনে জঙ্গলে, আরাম (গৃহে), বৃক্ষ-চৈত্যাদি (পূজা-স্থলে) নানা প্রকারের শরণপ্রার্থী হয়।]

শুধু কি তাই? ত্রাণের আশায় ভীত, ত্রাস্ত ও আশংকিত মানুষেরা সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে, সমুদ্রের অতল তলে ও গিরিগুহাগহ্বরের নিশ্ছিদ্র ঘন অন্ধকারে, এমন কি নীল নিঃসীম আকাশে গ্রহ-গ্রহান্তরে, স্বর্গে ও পাতালে গিয়েও আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস করে। এমন প্রয়াসের (ঘটনার) উল্লেখ প্রাচীন ভারতীয় ও বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। প্রাচীন ও পৌরাণিক সাহিত্যের ঐ সব ঘটনা অবিশ্বাস্য ও কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হলেও হতে পারে, তবে কিন্তু পাপকর্মের দুষ্পরিণাম ও সামাজিক লজ্জা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে, ঠিক ঐ ধরণের না হলেও, অন্য নিত্য নতুন বহু প্রকারের শরণগ্রহণের ব্যর্থ প্রয়াস মানুষ আজও করছে বা করাচ্ছে।

পাপকর্মের দুষ্পরিণাম পাপীকে আজ না হয় কাল, একদিন না একদিন, ভয়ানকরূপে না হলেও সামান্যরূপে নিশ্চয়ই ভুগতে হয়। এটাই প্রাকৃতিক বিধান (কর্ম নিয়াম)। এ অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যাপারে সতর্ক করে মহাকারুণিক বুদ্ধ পাপী-তাপী ও দুঃখী মানুষকে বার বার বলেছেন ------

"ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দমজ্ঝে,
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স,
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো,
যত্থট্ঠিতং নপ্পসহেথ মচ্চু।"

(ধম্মপদ/গাথা-১২৮)

[আকাশে, সমুদ্রের মাঝে আর পর্বতগহ্বরে এমন কি সংসারে এমন কোন স্থান নেই যেখানে শরণ নিলে মৃত্যু (পাশ) হতে মুক্তি পাওয়া (অর্থাৎ জীবনকে মৃত্যু রহিত করা) যেতে পারে।]

একবার তিনি এক অনুতপ্ত শ্রোতার মঙ্গলার্থে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন -----

"মাকাসি পাপকং কম্মং, আবি বা যদি বা রহো,
সচে চ পাপকং কম্মং করিস্সসি করোসি বা।
ন তে দুক্খা পমুত্যত্থি উপেচ্চাপি পলায়তো,
সচে ভায়সি দুক্খস্স, সচে তে দুক্খমপ্পিয়ং।"

(থেরীগাথাপালি/২৪৭-২৪৮)

[যদি (সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে) কোন পাপকর্ম (অতীতে) করে থাকো, তবে দুঃখকে দেখে (দুঃখের কথা ভেবে) পালিয়ে যেও না। (কারণ, পালিয়ে গেলেও) দুঃখ হতে রেহাই পাওয়া যায় না।]

দুঃখবর্জনের উপায় :

কৃত কর্মের বিপাক ভোগ হতে রেহাই নেই বটে তবে পাপকর্ম বর্জনের মাধ্যমে পাপকর্মজনিত সম্ভাব্য দুঃখবর্জন অবশ্যই সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আশার আলো জ্বালিয়ে উপদেশচ্ছলে বলেন -----

"তুয়েহব সাটকো হোতু, নাহমিচ্ছামি সাটকং,
সচে ভায়সি দুক্খস্স, সচে তে দুক্খং অপ্পিয়ং, ।
মাকাসি পাপকং কম্মং, আবি বা যদি বা রহো,
সচে চ পাপকং কম্মং, করিস্সসি করোসি বা ।"

(থেরীগাথা/২৪৬-২৪৭)

[যদি দুঃখকে ভাল না বাস, দুঃখ যদি সত্যই তোমার অপ্রিয় হয়, তবে প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপকর্ম করো না।]

"ন তে দুক্খা পমুত্যত্থি, উপেচ্চাপি পলায়তো,
সচে ভায়সি দুক্খস্স, সচে তে দুক্খং অপ্পিয়ং ।
উপেহি সরণং বুদ্ধং ধম্মং সংঘঞ্চ তাদিনং,
সমাদিয়াহি সীলানি, তং তে অত্থায় হেহিতি ।"

(থেরীগাথা/২৪৮-২৪৯)

[যদি (সত্যিই) দুঃখকে ভয় করে থাকো, (আর) যদি দুঃখ (সত্যিই) তোমার অপ্রিয় হয়ে থাকে, তবে বুদ্ধের শরণগ্রহণ কর। এমন ধর্ম ও সংঘেরও শরণগ্রহণ কর।]

ত্রিশরণগমনের ফল :

মানবের জীবনে সম্পাদিত বিবিধ পুণ্য (কুশল) বা সুখদায়ক কর্মের মধ্যে ত্রিশরণগ্রহণ বা গমনও একটি

পুণ্যকর্ম। এ পুণ্যকর্মের ফলও নিশ্চয়ই ভাল অর্থাৎ কাম্য ও সুখদায়ক ফল হবে। সমাজে বহু প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। প্রবাদ বাক্যটি এরূপ- ***"ধম্মো ধম্মিকং রক্খতি"*** [ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে।] এটি শুধু একটি লোককথা মাত্র নয়। এটি একটি বহু পরীক্ষিত নীতিকথাও। মাত্র এক দু'জনের কথায় বা বিশ্বাসে এটি সমাজে প্রচলিত হয় নি। বহু জ্ঞানী-গুণীজনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় এ নীতিবাক্য পুষ্ট। হাজারও হাজার বছর ধরে অগণিত প্রাণীর জীবনে তা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। এক কথায় এ বাক্য একটি কাল-পরীক্ষিত বাক্য। সত্যের পূজারী, সত্যের সন্ধানী ও সত্যের প্রতীক তথাগত বুদ্ধ - দেশিত ধর্মবাণীতেও এ নীতিবাক্যের পুষ্টি মেলে। পালি সাহিত্যেও বিশেষত পিটক সাহিত্যের যত্র তত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন বুদ্ধভাষিত বা বুদ্ধানুমোদিত ত্রিশরণগমনের সুফলের কয়েকটি মাত্র কথা এখানে তুলে ধরা হল।

ভয়মুক্তি :

"এবং বুদ্ধং সরন্তানং ধম্মং সংঘঞ্চ ভিক্খবে,
ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা ন হেস্সতী'তি।"

(ধজগ্গ-সুত্ত/সংযুত্তনিকায়)

[এমন (গুণসম্পন্ন) বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নেয়া হলে, শরণগমনকারী কোন প্রকারের লোমহর্ষক ভয়ে ভীত, স্তম্ভিত বা রোমাঞ্চিত হবে না।]

ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তি যেখানে আর যেভাবেই অবস্থান করুক না কেন, সে সব সময়ই নির্ভয়ে থাকে। সংসারে কোন প্রকারের ভয় দেখিয়ে কেহ তাকে ভীত ও ত্রাস্ত করতে পারে না। মৃত্যু ভয়েও সে ভীত হয় না।

দেবতাগণের আরক্ষাবরণ :

ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তি যে দেশে আর যে সমাজেই থাকুক না কেন মান্যগণ্য ব্যক্তিরূপে সুপ্রতিষ্টিত হন এবং পূজিত হন। শুধু দৃশ্যমান প্রাণীরা নয়, অদৃশ্যমান দেবতারাও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এমন ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তিকে আপদে বিপদে রক্ষা করেন। শাস্তা নিজে একথা স্পষ্টাকারে নিম্নোক্ত গাথায় বলেন --

"যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ সরণং গতো,
রক্খন্তি তং সদা দেবা সমুদ্দে বা থলেপি বা।"

(নন্দিরাজবগ্গ/রসবাহিনী)

পরমার্থ-সত্য ও দুঃখ-মুক্তির জ্ঞান :

শাস্তা বুদ্ধ এখানেই ক্ষান্ত হন নি। ত্রিশরণগমনের সুপরিণাম সম্পর্কে তিনি আরও বলেন --

"যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিয়সচ্চানি, সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি।"

(ধম্মপদ/গাথা-১৯০)

[বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘের শরণাপন্ন হন এমন ব্যক্তি সম্যক্ প্রজ্ঞায় চার আর্য্য সত্য দর্শন করেন।]

"দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং, দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিয়ঞ্চ ট্ঠঙ্গিকং মগ্গং, দুক্খূপসমগামিনং।"

(ধম্মপদ/গাথা-১৯১)

[বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন ব্যক্তি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের বিনাশ (নিরোধ) আর দুঃখের উপশমকারী (নিরোধগামী) মার্গকেও প্রজ্ঞাচক্ষুর মাধ্যমে দর্শন করেন।]

দুর্গতি-মুক্তি ও সুগতি-প্রাপ্তি :

ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তির বর্তমান জীবন তো সুরক্ষিত থাকেই, তার ভাবী জন্ম বা ভাবী জীবনও সুরক্ষিত থাকে। মৃত্যুর পর এমন প্রাণী দুর্গতি প্রাপ্ত (অপায়-যোনিতে জন্ম না নিয়ে) না হয়ে সুগতি প্রাপ্ত হয়। দেব-যোনিতে বা ব্রহ্ম-যোনিতে জন্ম নেয়। একথার পুষ্টিতে শাস্তা বলেন --

"যে কেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে,
ন তে গমিস্সন্তি অপায়ভূমিং,
পহায় মানুসং দেহং
দেবকায়ং পরিপূরেস্সন্তি।"

(মহাসময়-সুত্ত/দীঘনিকায়)

এভাবে ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তি ইহ ও পর জীবন-সংক্রান্ত যত প্রকারের দুঃখ (সমস্যা) রয়েছে সব ক'টির সমাধানে সমর্থ হন।

সংসারে হাজারও প্রকারের শরণ রয়েছে। তবে ত্রিশরণ বাদে আর যে সব শরণ রয়েছে ওসবের মাধ্যমে পাপী-

তাপী প্রাণী আংশিক ও সাময়িক ভাবে ত্রাণ পেয়ে থাকে। তার সার্বকালীন সমাধান হয় না। কিন্তু ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তি ত্রিশরণগমনের মাধ্যমে ওসব সমস্যার চিরস্থায়ী ও পূর্ণ সমাধান পান। শাস্তার নিম্নোক্ত গাথায় একথা আরও স্পষ্ট হয় ---

"এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং,
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।"

(ধম্মপদ/গাথা-১৯২)

[এ শরণই (প্রকৃত পক্ষে) ভয়মুক্ত (শরণ) স্থল, এ শরণই (প্রকৃত পক্ষে) উত্তম শরণ। এর শরণে এসে (শরণাপন্ন ব্যক্তি) সব দুঃখ হতে মুক্ত হয়।]

সত্য-শিব-সুন্দরের প্রাপ্তি :

এ ত্রিশরণগমনের মাধ্যমে পাপী-তাপী পূর্ণত পাপ পরিহার করেন আর আর্য্যপুরুষে পরিণত হন। পরমার্থ সত্য দর্শনের মাধ্যমে পরম সত্যের দর্শন করেন। পরম সত্য দর্শনের মাধ্যমে সাধক পরম শিব (নির্বাণ) পদ প্রাপ্ত হন। পরম শিবপদ ও সুখপদ নির্বাণ প্রাপ্তির মাধ্যমে শরণাপন্ন ব্যক্তি পরম সুন্দর পদের অধিকারী হন। তার সব আশা আকাঙ্খার পূর্তি হয়। তার জীবনে পূর্ণতা নেমে আসে।

নিষ্কর্ষত নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ত্রিশরণই সর্বশ্রেষ্ঠ শরণ। কারণ ত্রিশরণগমনের মাধ্যমে প্রাণী আত্মশরণই গ্রহণ করে। আত্মশরণই শ্রেষ্ঠ শরণ।

"অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা,
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।।"

(মহাবগ্গপালি/দীঘনিকায়)

ত্রিশরণ-গ্রহণের ফল :

প্রথম ফল

"যে কেচি বুদ্ধং ধম্মং সঙ্ঘং সরণং গতাসে
ন তে গমিস্সন্তি অপায়ং ভূমিং,
পহায় মানুসং দেহং দেবকায়ং পরিপূরেস্সন্তি।"

(মহাসময়-সুত্ত/দীঘনিকায়)

বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘের শরণাপন্ন হন এমন প্রাণী (ব্যক্তি) মৃত্যুর পর অপায়ে জন্ম গ্রহণ করে না। মৃত্যুর পর মানবদেহ ত্যাগ করে তারা দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। শাস্তার শরণাপন্ন ব্যক্তিগণ দেবলোকে জন্ম নেবার পর দেবলোকের অন্য দেবগণকে দিব্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ ও আধিপত্যের মাধ্যমে অভিভূত ও বশীভূত করেন। ইহলোকে ভূতপ্রেত, যক্ষ-রক্ষাদি ও দুর্গ্রহ-দুর্নিমিত্ত হতে যত রকমের ভয় ও উপদ্রবের শংকা রয়েছে তা ত্রিশরণাপন্ন প্রাণীর জীবনে শরণগ্রহণমাত্রই সমূলে বিনষ্ট হয়। সর্ববিধ মঙ্গল এ শরণগ্রহণের মাধ্যমে সাধিত হয়।

দ্বিতীয় ফল :

ত্রিশরণগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অঙ্গুত্তরনিকায়ের বেলামসূত্রে এরূপ বর্ণিত হয়েছে -----

শরণগ্রহণের পরম্পরা

(১) দৃষ্টিসম্পন্নকে অন্নদান দেবার চেয়ে সকৃদাগামীকে অন্নদান দেয়া অধিকতর ফলদায়ী হয়।

(২) সকৃদাগামীকে অন্নদান দেবার চেয়ে অনাগামীকে অন্নদান দেয়া অধিকতর ফলদায়ী হয়।

(৩) অনাগামীকে অন্নদান দেবার চেয়ে অর্হৎকে অন্নদান দেয়া অধিকতর ফলদায়ী হয়।

(৪) অর্হৎকে অন্নদান দেবার চেয়ে প্রত্যেকবুদ্ধকে অন্নদান দেয়া অধিকতর ফলদায়ী হয়।

(৫) প্রত্যেকবুদ্ধকে অন্নদান দেবার চেয়ে বুদ্ধপ্রমুখভিক্ষুসংঘকে অন্নদান দেয়া অধিকতর ফলদায়ী হয়।

(৬) সম্যক্ সম্বুদ্ধকে দান দেবার চেয়ে চারদিক হতে আগত-অনাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করিয়ে দেয়া অধিকতর ফলদায়ক।

(৭) একটি বিহার নির্মাণের চেয়ে একবার শ্রদ্ধাসহকারে ত্রিশরণগমন করার পুণ্য অধিকতর।

(৮) ত্রিশরণ-গমনের চেয়ে ত্রিশরণ সহ শীল-গ্রহণের পুণ্য অধিকতর।

(৯) শীল-গ্রহণের পুণ্যের চেয়ে মৈত্রী ভাবনা করার পুণ্য অধিকতর ফলদায়ী।

(১০) মৈত্রীভাবনার চেয়েও ক্ষণকালের অনিত্যভাবনার পুণ্যফল অধিকতর ফলদায়ী।

নৈতিক ও ধার্মিক দৃষ্টিতে এতে শীল-গ্রহণ-জনিত পুণ্যকর্মের ঔচিত্য সিদ্ধ হয় ও তজ্জনিত পুণ্যাংশ বেড়ে যায়। এ কারণে শীল-গ্রহণের চেয়েও শরণগ্রহণ শ্রেষ্ঠ। কাজেই এমন শ্রেষ্ঠ পুণ্যফল-দায়ক 'শরণগ্রহণ'-জনিত কর্মটি ছেলেখেলা ভেবে তুচ্ছজ্ঞানে করা কারও পক্ষেই উচিত নয়। শরণ-গ্রহণের গুরুত্ব বুঝে শ্রদ্ধা ও স্মৃতির সাথে শরণ-গ্রহণ করলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়। ত্রিরত্নের প্রতি জীবন উৎসর্গ করে 'শরণ-গ্রহণ' করাটাই উত্তম শরণ গ্রহণ। তাই ত্রিরত্ন-বন্দনা কালে বৌদ্ধদের মধ্যে নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করার এক সুন্দর পরম্পরা রয়েছে ----

বুদ্ধং যাব নিব্বাণং পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

[নির্বাণলাভ না করা অবধি বুদ্ধের শরণাপন্ন হলাম।]

ধম্মং যাব নিব্বাণং পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

[নির্বাণলাভ না করা অবধি ধর্মের শরণাপন্ন হলাম।]

সংঘং যাব নিব্বাণং পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

[নির্বাণলাভ না করা অবধি সঙ্ঘের শরণাপন্ন হলাম।]

ত্রি-শরণ-গ্রহণের সুফলপ্রাপ্তির সুনিশ্চিত আশ্বাসন :

ত্রিশরণ-গ্রহণের সুফল যে শুধুমাত্র ঘরে মন্দিরেই পাওয়া যায়, তা নয়। ত্রিশরণ-গ্রহণের সুফল সব সময় ও সর্বত্র পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে শাস্তা স্বয়ং তাঁর দেশিত ধ্বজাগ্রসূত্রের একাংশে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ----

"অরঞ্ঞে রুক্খমূলে বা সুঞ্ঞাগারে ব ভিক্খবে;
অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং ভয়ং তুম্হাকং নো সিয়া।
নো চে ধম্মং সরেয়্যাথ লোকজেট্ঠং নরাসভং;
অথ ধম্মং সরেয়্যাথ নিয়্যানিকং সুদেসিতং।
নো চে ধম্মং সরেয়্যাথ নিয়্যানিকং সুদেসিতং,
অথ সঙ্ঘং সরেয়্যাথ পুঞ্ঞক্খেত্তং অনুত্তরং।
এবং বুদ্ধং সরন্তানং ধম্মং সঙ্ঘঞ্চ ভিক্খবো,
ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো ন হেস্সতী'তি।"

(ধজগ্গ-সুত্ত/সংযুত্তনিকায়)

উপরোক্ত সূত্রাংশের সারার্থ এরূপ ----

মাঠে ঘাটে শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে গিরি-গুহা-গহ্বরে শশ্মানে অরণ্যে যেখানেই হউক না কেন, কেহ যদি কোন কারণে ভীত-ত্রস্ত হয়ে থাকো তবে সম্বুদ্ধের শরণ নাও। সে ভীতিভাব যতই ভয়ানক হউক না, যতই রোমাঞ্চকর হউক না কেন, আর যতই লোমহর্ষক হউক না কেন, অচলা অটলা শ্রদ্ধায় সম্বুদ্ধের শরণ নেয়া মাত্রই ভীতের ভীতিভাব তৎক্ষণাৎ দুর হয়ে যাবে।

আর যদি কেহ কোন কারণে সংসারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ সম্বুদ্ধের শরণে যেতে অনিচ্ছুক থাকে, তবে সে সম্যক্ সম্বুদ্ধের সুদেশিত ধর্মের শরণাপন্ন হতে পারে। শাস্তার শরণাপন্ন না হয়ে তাঁর সুদেশিত ধর্মে অচলা অটলা শ্রদ্ধায় শরণাপন্ন হলেও সে তার ভীতিভাব হতে নিঃসন্দেহে মুক্তি পাবে।

আর যদি কেহ কোন কারণে শাস্তার সুদেশিত ধর্মের শরণে যেতে অনিচ্ছুক থাকে তবে সে শাস্তার সুপ্রাতিষ্ঠিত অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের শরণাপন্ন হতে পারে। শাস্তার বা তাঁর সুদেশিত ধর্মের শরণাপন্ন না হয়ে, অচলা অটলা শ্রদ্ধায় শুধু মাত্র শাস্তার সুপ্রতিষ্ঠিত অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সংঘের শরণাপন্ন হলেও সে তার ভীতিভাব হতে মুক্তি পাবে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এভাবে ভীত-ত্রস্ত মানুষ (প্রাণী) যদি সজ্ঞানে ও সশ্রদ্ধায় পৃথকভাবে ত্রিরত্নের যে কোন একটিতে বা সামূহিকভাবে তিনটিতেই শরণ নিয়ে থাকলে শরণার্থী সুনিশ্চিতভাবে ভয়মুক্ত হবে।

ত্রিশরণ ও আত্মশরণ :

বোধিসত্ব সিদ্ধার্থের (গৌতম) বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও গৌতম বুদ্ধের সুদীর্ঘ পয়ঁতাল্লিশ বছরের ধর্মপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী দেব-মানব-ব্রহ্মা প্রমুখ সকল দুঃখী প্রাণীকে, বিশেষত মানুষকে, তার বিবিধ লৌকিক সমস্যা মুক্তি ও পারলৌকিক মুক্তি প্রাপ্তির প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বী করা। মানুষকে তার নিজের অধিকার ও দায়িত্ব বোধ করানো।

সাধারণত দেখা যায় সংকীর্ণ স্বার্থপরতার কারণে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি শরণপ্রার্থীকে (তার দুর্বলতার সুযোগ বুঝে) কারণে অকারণে সজ্ঞানে অজ্ঞানে পথভ্রষ্ট বা পথচ্যুত করায় বা করানোর অপপ্রয়াস করে থাকে। প্রচণ্ড

আত্মপ্রত্যয় না থাকলে পরাবলম্বীমাত্রেরই জীবনে লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথ হতে পথচ্যুত হবার আর ভয় উৎপন্ন হবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। স্বেচ্ছায় যথেচ্ছা বিচরণের অর্থাৎ জীবন যাপনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রতা শরণার্থীর স্বভাব-দোষে সহজে নিজের অজান্তেই হারিয়ে ফেলে।

সৌগত শাসনে পরাবলম্বী হওয়াকেও পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে ***(যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং)*** 'দুঃখ' সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তদুপরি শরণদাতা (স্থল) ও শরণ-প্রার্থীর লক্ষ্যস্থল (বিন্দু) যদি শরণার্থীর কাছে অদৃশ্য, অপরিচিত, অননুভূত ও রহস্যময় থাকে, তবে তা শরণার্থীকে আরো দীর্ঘকালীন 'দুঃখ' (অপ্রত্যাশিত অপ্রিয় অনুভূতি) প্রদান করে। এ কারণে পরাবলম্বী হবার সম্ভাব্য দুস্পরিণামের কথা স্মরণ ও সচেত করিয়ে দিয়ে শাস্তা দুঃখী প্রাণীকে স্বাবলম্বী হবার বার বার আহ্বান জানিয়েছেন আর বলেছেন ------

"অত্তাহি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো সিয়া,
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।"

(ধম্মপদ/গাথা-১৬০)

অর্থাৎ প্রাণী নিজেই নিজের 'নাথ'। একজন আরেক জনের 'নাথ' কি করে হতে পারে? নিজেকে সুদমিত রেখেই সে দুর্লভ 'নাথ' (অপ্রকম্পিত দৈহিক ও মানসিক স্থিতি) লাভ করে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে শাস্তা দেশনাচ্ছলে আরও বলেছেন - ***'অত্তদীপা বিহরথ, অত্তসরণা অনঞ্ঞ-সরণা'*** (নিজেই প্রদীপ হয়ে বিচরণ কর, আত্মশরণই অনন্যশরণ)।

এখানে একটি তর্কসংগত প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তা হল--- তা হলে শাস্তা স্বয়ং দুঃখী প্রাণীকে ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হবার পরামর্শ কেন দিয়েছেন? তাঁর উপরোক্ত দুই পরামর্শে বিরোধাভাস প্রতিভাত হয় না কি?

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত দুই পরামর্শ বিরোধাভাসী বলে মনে হলেও বস্তুত ত্রিশরণগমন ও আত্মশরণগমনে কোন প্রকারের বিরোধাভাস নেই। অদৃষ্ট, অননুভূত ও রহস্যময়ী ঈশ্বরের বা তার সৃষ্ট আত্মা'র (আত্মার স্বরূপ- সন্ধানে অমূল্য সময়ের অপচয় না করে) শরণে না গিয়ে 'আত্ম'-শরণে যাবার এক অভিনব পরামর্শ ও পথের সন্ধান দেন শাস্তা বুদ্ধ। এই আত্ম-শরণের (সন্ধানের) অর্থ হল 'আত্ম'-বিশ্লেষণ এবং অনাত্মধর্মীতাকে বোঝা।

আত্ম-বিশ্লেষণের অভিনব মার্গের আবিষ্কর্তা হলেন স্বয়ং শাস্তা তথাগত বুদ্ধ। দেব-মানব-ব্রহ্মার অনুপম শিক্ষক (শাস্তা) রূপে তিনি অতি চর্চিত ও বিশ্বজন-বন্দিত। কাজেই আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়াসে এমন্ বুদ্ধের শরণে যাওয়ায় (তাঁর আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ পালন করায়) কোন প্রকারের বিরোধাভাস পরিলক্ষিত হয় না। শাস্তার ব্যক্তিত্ব ছিল অতুলনীয়। দৈহিক ও মানসিক দুই দৃষ্টিতেই তিনি পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর শিষ্যশিষ্যাগণের কিছু শাস্তার দৈহিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতেন। তাদের মোহ-ভঙ্গ করানোর উদ্দেশ্যে শাস্তাকে বলতে হতো - - "আমি মুক্তিদাতা নই, মার্গদাতা মাত্র *('তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো*

তথাগতা'- ধম্মপদ/গাথা-২৭৬) । আমার চীবরের কোণা ধরে থাকলেও কেহ নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। আর কেহ কাউকে নির্বাণ দেওয়াতেও পারবে না। মোহাসক্ত হয়ে পঞ্চমুখে আমার রূপের প্রশংসা করলেও নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত হবে না। বরংচ এ মোহভাব প্রশংসকের আধ্যাত্মিক সুখ-শান্তি-প্রগতি প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। আমার রূপকে না দেখে আর আমার রূপে মুগ্ধ না হয়ে যারা আমার দেশিত ধর্মকে দেখেন (স্মৃতি-প্রস্থানের অভ্যাসের মাধ্যমে আত্ম-বিশ্লেষণ করে এবং প্রতীত্যসমুৎপন্ন ধর্মের প্রত্যবেক্ষণ করে) তারাই প্রকৃতপক্ষে আমাকে দেখেন।"

"অলং বক্কলি, কিংতে ইমিনা পূতিকায়েন দিট্ঠেন?
যো খো, বক্কলি, ধম্মং পসতি সো মং পস্সতি;
যো মং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি। ধম্মঞ্হি, বক্কলি,
পস্সন্তো মং পস্সতি; মং পস্সন্তো ধম্মং পস্সতি।"

বক্কলি-সংযুক্তনিকায়

যো হি পস্সতি সদ্ধম্মং, মং পস্সতি পণ্ডিতো।
অপস্সমানো সদ্ধম্মং, মং পস্সম্পি ন পস্সতি।।

বক্কলিথের-অপদানপালি

এতেই স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে লোকদেখানো বুদ্ধের শরণে যাবার চেয়ে ধর্মের শরণে যাওয়াটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের শরণে যাবার উদ্দেশ্যই হল আত্ম-শরণে যাওয়া। আত্ম-শরণে যাবার উদ্দেশ্য হল আত্ম-বিশ্লেষণ করা।

আত্ম-বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্য হল কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্ম-স্বরূপ জানা। আর আত্ম-স্বরূপ জানার অর্থ হল শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাময় মধ্যমমার্গের অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা। আত্ম-শুদ্ধিতেই এক চিরস্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধির প্রাপ্তি ও আত্মোত্থান করা সম্ভব।

তা যদি হয়, তবে সংঘের ভূমিকা কি? সংঘের ভূমিকা দু প্রকারের। প্রথমতঃ, শাস্তার অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবর্তিত সদ্ধর্মের বিশেষতা সম্পর্কে দুঃখী প্রাণীজগতকে অবহিত বা দিগ্দর্শন করানো। শাস্তার অভাবে মার্গদাতা বা মার্গদর্শক হবার দায়িত্ব পালন করে সংঘ। দ্বিতীয়ত, সংঘই শাস্তার অভাবে বা অবর্তমানে সদ্ধর্মের ধারক, বাহক এবং সংরক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এ কারণে সংঘের শরণাপন্ন হলেও সংঘ শরণার্থীকে শাস্তার ন্যায় বলবে ---

"ধর্মের শরণ নাও। ধর্মের শরণাপন্ন হও। ধর্মের শরণ না নিয়ে শুধু মাত্র সংঘের শরণ নিলে কোন মহৎ উদ্দেশ্যরই পূর্তি হবে না।

'ধর্ম'ই মূল মণি। ধর্মরত্নই মধ্যম মণি। ধারক, বাহক ও সংরক্ষকের অভাবে ধর্ম যেন হেয় হয়ে পড়ে। ধর্ম যেন অর্থহীন হয়ে পড়ে। ধর্ম যেন অকেজো আর প্রকাশহীন হয়ে পড়ে। কালান্তরে কোন হীরক গবেষকের দৃষ্টিতে ধূলো মাটিতে চাপা পড়ে থাকা সেই অদৃশ্য রত্নের দৃষ্টিগোচরীভূত হবার ন্যায় শাস্তা সম্যক্ সম্বুদ্ধের সন্ধানী দৃষ্টিতে বহুযুগের লুপ্ত-প্রায় ধর্মরত্ন পুনরায় গোচরীভূত হয়।

বোধিবৃক্ষতলে তা আবিস্কৃত হয়। ধর্মচক্র-প্রবর্তনসূত্ররূপে শাস্তার মাধ্যমে পুন মানবসমাজে তা প্রকটিত হয়। শাস্তা কর্তৃক আবিস্কৃত, পরিস্কৃত ও প্রদত্ত অমূল্য ধর্মরত্নকে তার মৌলিক অবস্থায় স্বচ্ছ ও শুদ্ধ রাখা এবং তাকে ভাবী বংশধরদের হাতে তুলে দেয়া সংঘের দায়িত্ব। সংঘ তা পবিত্রতার সাথে পালন করেন।

কাজেই ত্রিশরণ-গ্রহণের মাধ্যমে শরণার্থী মূলতঃ ধর্মেরই শরণগ্রহণ করে। আর প্রকারান্তরে সে আত্মশরণই গ্রহণ করে। এভাবে ত্রিশরণগ্রহণ ও আত্মশরণগ্রহণের নির্দেশে কোন বিরোধাভাস নেই। ত্রিশরণগ্রহণ আত্মশরণগ্রহণেরই এক সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পূরক অঙ্গ বা পদক্ষেপ মাত্র। আত্মোত্থানের বা মানবীয় গুণের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে যত প্রকারের শরণস্থলের উদ্ভবের উল্লেখ মেলে তার মধ্যে ত্রি-রত্নই সর্বোত্তম শরণস্থল। এর আদিতে কল্যাণ হয়। এর মধ্যেও কল্যাণ হয়। এর শেষেতেও কল্যাণ হয়। ত্রিরত্নের শরণাপন্ন ব্যক্তির জীবনে তা কোন প্রকারের অকল্যাণকারী হয় না। এমন কি এ তিনের শরণাপন্ন নন এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহের জীবনেও ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তি অকল্যাণকারী হয় না। তর্কসম্মতভাবে বলতে হলে বলতে হয় ত্রিশরণগমন সর্বজনকল্যাণকারী না হলেও তা বহুজনকল্যাণকারী। এটি একটি কাল পরীক্ষিত, সর্বজনবিদিত ও ইতিহাসসিদ্ধ ঘটনা।

ত্রিশরণ-গ্রহণ-পরম্পরার প্রাচীনতা ঃ

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ ত্রিশরণগ্রহণের পরম্পরার সূত্রপাত গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বারাণসীর এক স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠীর (যশের পিতা শ্রেষ্ঠী) ত্রিশরণগ্রহণের পর হতে হয়েছিল। সেই গৌরবোজ্বল পরম্পরা আজও প্রবহমান রয়েছে, তবে অনেক বাধা-বিপত্তির চড়াই উতরাই পেড়িয়ে।

মূল পালি সাহিত্যের ভিত্তিতে একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে বলা যেতে পারে যে এ ত্রিশরণগ্রহণের পরম্পরা গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশা হতে শুরু হয় নি। কারণ বৌদ্ধ পরম্পরামতে গৌতম বুদ্ধ সংসারের প্রথম বা শেষ বুদ্ধ নন। শাস্তা গৌতম বুদ্ধ নিজেই কয়েকটি প্রসঙ্গে, বিশেষত একবার তাঁর পিতা শাক্যরাজ শুদ্ধোদনকে বলেছিলেন --- 'তিনি শাক্যরাজবংশের ধারক ও বাহক নন। ঘরে ঘরে ঘুরে ভিক্ষাচরণ করাই বুদ্ধগণের গৌরবোজ্বল পরম্পরা।' কোন এক ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা এক বা দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বা অবদানে সৃষ্ট হয় না। বহু ব্যক্তির মহান ব্যক্তিত্বের অবদানে কোন এক পরম্পরার সৃষ্টি হয় এবং তার ধারক ও বাহকগণের অবদানে ঐ পরম্পরা প্রবহমান থাকে। ত্রিশরণগ্রহণের পরম্পরার সাথে বুদ্ধগণের বংশের পরম্পরার এক অভিন্ন নাভি-সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধগণের ঐ পরম্পরার সূত্রপাত ঠিক কখন শুরু হয়েছিল তা বলা না গেলেও একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে বর্তমান গৌতম বুদ্ধেরও পূর্ববর্তী অন্ততপক্ষে ২৭ জন

বুদ্ধের নামের উল্লেখ একাধিক বৌদ্ধ শাস্ত্রে রয়েছে। পালি সাহিত্যে প্রাপ্ত বুদ্ধগণের নামের তালিকায় তণ্হঙ্করো বুদ্ধের নাম সর্বাগ্রে রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে ঐ বুদ্ধই এ বুদ্ধ-বংশের প্রথম বুদ্ধ। সংসারে উৎপন্ন বুদ্ধগণের বংশপরম্পরার তিনি একজন ধারক ও বাহক মাত্র। ***তণ্হঙ্করো*** বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের নাম-তালিকা পাওয়া না গেলেও পরম্পরামতে মানা হয় এ বুদ্ধগণের কোন এক বিশেষ আদি-বুদ্ধ নেই। আবার অনুরূপভাবে কোন এক বুদ্ধ এ পরম্পরার অন্তিম-বুদ্ধও নন। এক বা একাধিক কারণে এ ধর্ম লুপ্ত হলে দুঃখী প্রাণীর উদ্ধারে এক না এক বুদ্ধ এ সংসারে উৎপন্ন হন। তিনি তাঁর বোধিসত্ত্ব-চরিয়ার ও বুদ্ধচরিয়ার সুদীর্ঘ অতীতকথা স্মৃতির মণি কোঠা হতে একে একে উদ্ধার করে শিষ্যসমূহকে অবহিত করান। আর তাঁদেরকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যে অতীতের দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় হতে তাঁর বোধিসত্ত্ব-চরিয়ার প্রারম্ভ ঘটে। তাঁর মহাপরিনির্বাণের সাথে এ বুদ্ধ-পরম্পরার দীপশিখা নির্বাপিত হবে না। একথা স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দেশনায় ভাবী বুদ্ধের নামও উল্লেখ করেন। ***'বুদ্ধবংস'*** মতে বর্তমান গৌতম বুদ্ধ (নিজের নাম বাদ দিয়ে) অপর যে ২৮ জন বুদ্ধগণের নাম উল্লেখ করেছেন তা এরূপ ----

(১) তণ্হঙ্করো, (২) মেধঙ্করো, (৩) সরণঙ্করো, (৪) দীপঙ্করো, (৫) কোণ্ডঞ্ঞো, (৬) মঙ্গলো, (৭) সুমনো, (৮) রেবতো, (৯) সোভিতো,

(১০) অনোমদস্সী, (১১) পদুমো, (১২) নারদো, (১৩) পদুমুত্তরো, (১৪) সুমেধো, (১৫) সুজাতো, (১৬) পিয়দস্সী, (১৭) অত্থদস্সী, (১৮) ধম্মদস্সী, (১৯) সিদ্ধত্থো, (২০) তিস্সো, (২১) ফুস্সো, (২২) বিপস্সী, (২৩) সিখী, (২৪) বেস্সভূ, (২৫) ককুসন্ধো, (২৬) কোনাগমনো, (২৭) কস্সপো, (২৮) মেত্তেয়্যো।

পালি সাহিত্যের অন্য আরও কিছু গ্রন্থেও তৃষ্ণংকর বুদ্ধ হতে আরম্ভ করে বর্তমান গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী কাশ্যপ বুদ্ধের অবধি যে ২৭ জনের নামোল্লেখ পাওয়া যায় তা এরূপ--

তণ্হঙ্করো, মেধঙ্করো, অথোপি সরণঙ্করো।
দীপঙ্করো চ সম্বুদ্ধো, কোণ্ডঞ্ঞো দ্বিপদুত্তমো।।
মঙ্গলো চ সুমনো চ, রেবতো সোভিতো মুনি।
অনোমদস্সী, পদুমো, নারদো পদুমুত্তরো।।
সুমেধো চ সুজাতো চ, পিয়দস্সী মহাযসো।
অত্থদস্সী, ধম্মদস্সী, সিদ্ধত্থো লোকনায়কো।।
তিস্সো ফুস্সো চ সম্বুদ্ধো, বিপস্সী সিখী বেস্সভূ।
ককুসন্ধো কোণাগমনো, কস্সপো চাপি নায়কো।।
এতে অহেসুং সম্বুদ্ধো, বীতরাগা সমাহিতা।
সতরংসীব উপ্পন্না, মহাতমবিনোদনা
জলিত্বা অগ্গিক্খন্ধাব, নিব্বুতা তে সসাবকা"তি।।

মধুরত্থবিলাসিনি (বুদ্ধবংস-অট্ঠকথা)

শরণগ্রহণের পরম্পরা

'রসবাহিনী' নামক গ্রন্থে শাক্যবংশে জাত গৌতম বুদ্ধ সহ আঠাইশ জন বুদ্ধের নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। নামগুলো এরূপ--

তণ্হঙ্করো মহাবীরো, মেধঙ্করো মহাযসো,
সরণঙ্করো লোকহিতো, দীপঙ্করো জুতিন্ধরো।
কোণ্ডঞ্ঞো জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,
সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো রতিবদ্ধনো।
সোভিতো গুণসম্পন্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো,
পদুমো লোকপজ্জোতো, নারদো বরসারথী।
পদুমুত্তরো সত্ত সারো, সুমেধো অগ্গপুগ্গলো,
সুজাতো সব্বলোকগ্গো, পিয়দস্সী নরাসভো।
অত্থদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো,
সিদ্ধত্থো অসমো লোকে, তিস্সো বরদসংবরো।
ফুস্সো বরদসম্বুদ্ধো, বিপস্সী চ অনুপমো,
সিখী সব্বহিতো সত্থা, বেস্সভূ সুখদায়কো।
ককুসন্ধো সত্থবাহো, কোণাগমনো রণঞ্জহো,
কস্সপো সিরিসম্পন্নো, গোতমো সাক্যপুঙ্গবো।
তেসং সচ্চেন সীলেন, খন্তিমেত্তবলেন চ,
তে পি মং অনুরক্খন্তু, আরোগ্যেন সুখেন চা' তি।

(রসবাহিনী)

শরণগ্রহণের পরম্পরা

পালি	বাংলা অর্থ
০১। মহাবীরো তণ্হঙ্করো	মহাবীর তৃষ্ণঙ্কর বুদ্ধ।
০২। মহায়সো মেধঙ্করো	মহাযশশী মেধঙ্কর বুদ্ধ।
০৩। লোকহিতো সরণঙ্করো	লোকহিতকারী শরণঙ্কর বুদ্ধ।
০৪। জুতিন্ধরো দীপঙ্করো	জ্যোতির্ময় দীপঙ্কর বুদ্ধ।
০৫। জনপামোক্খো কোণ্ডঞ্ঞো	জননায়ক কৌণ্ডিণ্য বুদ্ধ।
০৬। পুরিসাসভো মঙ্গলো	পুরুষশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বুদ্ধ।
০৭। সুমনধীরো সুমনো	সুমনধীর সুমন বুদ্ধ।
০৮। রতিবদ্ধনো রেবতো	রতিবর্দ্ধক রেবত বুদ্ধ।
০৯। গুণসম্পন্নো সোভিতো	গুণসম্পন্ন শোভিত বুদ্ধ।
১০। অনুত্তমো অনোমদস্সী	উত্তমজন অনোমদর্শী বুদ্ধ।
১১। লোকপজ্জোতো পদুমো	লোকপ্রদ্যোৎ পদুম বুদ্ধ।
১২। বর সারথী নারদো	শ্রেষ্ঠ সারথী নারদ বুদ্ধ।
১৩। সত্তসারো পদুমুত্তরো	সত্ত্বসার পদুমুত্তর বুদ্ধ।
১৪। অগ্গপুগ্গলো সুমেধো	অগ্রপুদ্গল সুমেধ বুদ্ধ।
১৫। সব্বলোকগ্গো সুজাতো	সর্বলোকশ্রেষ্ঠ সুজাত বুদ্ধ।
১৬। নরাসভো পিয়দস্সী	নরাষভ প্রিয়দর্শী বুদ্ধ।
১৭। কারুণিকো অত্থদস্সী	কারুণিক অর্থদর্শী বুদ্ধ।
১৮। তমনুদো ধম্ম দস্সী	অন্ধকার বিনোদনকারী ধর্মদর্শী বুদ্ধ।
১৯। লোকে অসমো সিদ্ধত্থো	জগতে অতুলনীয় সিদ্ধার্থ বুদ্ধ।
২০। বরসংবরো তিস্সো	বরদ সংবর তিষ্য বুদ্ধ।
২১। বরদ-সম্বুদ্ধো ফুস্সো	বরদ সম্বুদ্ধ ফুস্য বুদ্ধ।
২২। অনুপমো বিপস্সী চ	অনুপম বিপশ্যী বুদ্ধ।
২৩। সব্বহিতো সত্থা সিখী	সর্বহিতকারী শাস্তা শিখী বুদ্ধ।
২৪। সুখদায়কো বেস্সভূ	সুখদায়ক বেশ্যভূ বুদ্ধ।
২৫। সত্থবাহ-ককুসন্ধো	সার্থবাহ ককুসন্ধ বুদ্ধ।

২৬। রণঞ্জহো কোণ-গমনো - রণত্যাগী কোনাগমন বুদ্ধ।

২৭। সিরিসম্পন্নো কস্সপো - শ্রীসম্পন্ন কাশ্যপ বুদ্ধ।

২৮। সাক্যপুঙ্গবো গোতমো - শাক্যপুঙ্গব গৌতম বুদ্ধ।

প্রত্যেক বুদ্ধ তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধের পরম্পরাকে অনুশরণ করেন। নতুন কিছুরই প্রবর্তন তিনি করেন না। প্রত্যেক বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিকালে তাঁর পূর্ববর্তী বুদ্ধের আবিস্কৃত ধর্মের পুনরাবিষ্কার করেন। আর ধর্মচক্রপ্রবর্তনসূত্রের দেশনার মাধ্যমে ঐ সুপ্ত-প্রায় ধর্মের বর্হিপ্রকাশ ঘটে। এর অর্থ এ নয় যে এ সংসারে কেবল মাত্র ২৮ বা ২৯ জন বুদ্ধই উৎপন্ন হন বা হবেন। গৌতম বুদ্ধ সহ ২৮ জন বুদ্ধের পূর্বেও অসংখ্য বুদ্ধ হয়েছিলেন; আর এদের পরেও অসংখ্য বুদ্ধ হবেন। এভাবে বলা যেতে পারে ত্রিশরণগ্রহণের পরম্পরাটি মানবসমাজে উপলব্ধ বহু পরম্পরার মধ্যে একটি অন্যতম ও সর্বাধিক প্রাচীন পরম্পরা। এটি একটি সনাতন পরম্পরা।

'শরণ' ও 'সরণ'-শব্দ দু-এর উৎপত্তি ও অর্থ

'শরণ'-শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ। বাংলাতেও এ শব্দটির বহুল প্রচলন রয়েছে। 'শরণ'-এর পালি-রূপ হল 'সরণ'। বাংলা ও সংস্কৃতে 'শরণ'-শব্দের প্রয়োগ একমাত্র 'আশ্রয়' অর্থে হয়েছে। কিন্তু পালিতে 'সরণ'-শব্দের অর্থ ওর সংস্কৃত রূপ 'শরণ'- এর অর্থ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থে করা হয়েছে। এর এ ব্যাপকতর অর্থের সীমা জানার উদ্দেশ্যে 'সরণ'- শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের অনুধাবন আবশ্যক।

'সরণ'- শব্দের সৃষ্টি:- এর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া দু'ভাবে অনুধাবনীয়। প্রথমটি হল 'স+রণ'= 'সরণ', আর দ্বিতীয়টি হল 'সর,- অন্' = 'সরণ'। (১) প্রথম বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে 'রণ' হল মূল শব্দ। এর আদিতে 'স'-অক্ষর যুক্ত হয়েছে। এ দুয়ের সংযোগে 'সরণ'-শব্দের সৃষ্টি। 'রণ'-শব্দের অর্থ যুদ্ধ। প্রকারান্তরে তা 'রণ' বা যুদ্ধ কৌশল সূচকও হয়। 'সহ' অর্থে 'স'-এর প্রয়োগ হয়েছে এখানে। এ দুয়ের মিলনে সংগঠিত 'সরণ'-শব্দের অর্থ হয় সৈন্যবাহিনীর রণ-কৌশলে সুদক্ষ এক সেনা-অধিপতির পূর্ণ যুদ্ধস্তরীয় প্রস্তুতির মনোভাব। রণভূমিতে যাবার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার বা প্রস্তুতি নেবার প্রয়োজন হয় কেন? শত্রুর দমন বা সমূল-বিনাশের উদ্দেশ্যেই যুদ্ধের (রণ) প্রয়োজন হয়। অনুদ্যমী ও অপ্রস্তুত সেনাবাহিনী নিয়ে রণে নামার অর্থই হল নির্ঘাত পরাজয়ের মুখ দেখা। রণে বিজয়শ্রী পেতে হলে রণকৌশলে কুশলী ও চির উদ্যমী সেনাসমূহের উপস্থিতি ও সুসঞ্চালন অত্যাবশ্যক। শত্রুর সমূল বিনাশের এই প্রস্তুতিকে 'সরণ'-সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে।

পালি সাহিত্যে 'সরণ-শব্দ হিংসা-অর্থেও প্রযুক্ত হয়। সমস্ত প্রকারের অনর্থকারী অপায়দুক্খকে হিংসা করে, বিনাশ করে আর বিধ্বংস করে।

"হিংসতীতি সরণং, সব্বং অনাথং অপায়দুক্খং
সব্বং সংসারদুক্খং হিংসতি বিনাসেতি বিধংসেতি অত্থো।"

পুত্তসুত্তবণ্ণনা-খুদ্দকনিকায়

'শরণ' (সরণ)-গমনের প্রসঙ্গে এ 'সরণে'র প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত বা সন্দেহ উৎপন্ন হতে পারে। সমাজে সমস্যা সৃষ্টির বা সমাধানের উদ্দেশ্যে কালে কালান্তরে ঘোষিত বা অঘোষিত যুদ্ধ ঘটানো হয়ে থাকে। কিন্তু প্রাণীর অস্তিত্বে বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল শুভ ও অশুভ তত্ত্বের (ধর্মে) মধ্যে যুদ্ধ (রণ) চলছে অহরহ। প্রাণীর সৃষ্টির আদিক্ষণ হতে তা চলে আসছে প্রচ্ছন্নভাবে। বিকটতর হলে তা ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বিশ্বের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে ভয়াবহ যুদ্ধরূপে ব্যাপকভাবে প্রকটিত হয়। প্রাণীর উচিত ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরীণ এ যুদ্ধের যেন বিস্ফোরণ না ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়াসশীল থাকা। এতে প্রয়াসশীল থাকার অর্থই হল প্রাণীর আভ্যন্তরীণ অশুভ তত্ত্বেরই (ধর্মের) জয় হয়ে থাকে। পরিণামে জীবন দুর্বিসহ হয়। তা দুঃখ দেয় আর দুর্গতি ডেকে আনে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত এ যুদ্ধে জয়ী হতে না পারলে তা চলতে থাকে অবিরাম আর চলতে থাকে অনন্তকাল। এ সম্ভাবিত অনন্তকালীন যুদ্ধকে অনির্বাণকাল যুদ্ধে রূপান্তরিত করাটা একাধিক কারণে মানবেতর প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয় না। মানবের পক্ষে তা কিন্তু সম্ভব।

সত্যান্বেষণকালে 'মার'- বিজয়ের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধ তা আবিষ্কার করেন। এ 'মার' কি বা কে?- তার স্বরূপ মার-মুক্তি-মার্গের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে ভগবান বুদ্ধ ধর্ম-প্রচার করেন। জনসমাজে তা বুদ্ধবাণী বা সদ্ধর্মরূপে খ্যাত

বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্মপিটক-আকারে তা তিন ভাগে বিভাজিত। এ ত্রিপিটকে জীবনের সমস্যাসমূহ নানাভাবে চিহ্নিত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে আর ব্যাখ্যাত হয়েছে। আর এ সব সমস্যা সমাধানের-উপায়ও বর্ণিত হয়েছে।

'মারে'র (শত্রুর) স্বরূপকেও এ তিন পিটকে একাধিকভাবে দর্শানো হয়েছে। বিনয়পিটকে আপত্তিধর্মসূমহকে 'মার'রূপে বোঝানো হয়েছে। আপত্তিধর্মসমূহের প্রভাবে মানুষ দুঃখ-দুর্দশার মুল কারণ (মার) রূপে অনীতি, কুনীতি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কারকে দর্শানো হয়েছে। অভিধর্মপিটকে অবিদ্যা আর অবিদ্যাজনিত তৃষ্ণা প্রমুখ মানসিক বিকার-সমূহকে 'মার'রূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রজ্ঞাভিত্তিক মধ্যমমার্গের অনুশীলনের মাধ্যমে মার-মর্দন ও মার-উন্মূলনের পথ-প্রদর্শনও অভিধর্মপিটকে বিধৃত হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে 'সরণ'-শব্দের সৃষ্টি 'সর'-ধাতুতে 'অন্'-প্রত্যয়যোগে হয়েছে। 'সর'-ধাতু 'গতি'-অর্থে প্রযুক্ত হয়। এর অর্থ যাওয়া, গমন করা লক্ষ্যাভিমুখী হওয়া। অতএব 'সরণ'-শব্দের মূল অর্থ হল 'গমনশীল এবং উদ্যমী থাকা'।

'সরণ' ও 'শরণ'-শব্দ-দুয়ের সারার্থ

উপরোক্ত দুটি অর্থের যে কোনটিই গ্রহণ করা হউক না কেন, দুটির কোনটিতেই আলস্য ও অনুদ্যমী ভাব-এর

স্থান নেই। ভগবান বুদ্ধ প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি গুণে গুণান্বিত থেকে শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও প্রতিপক্ষকে বিফল করার অদম্য সংকল্প ও উদ্দাম উদ্যমী থাকাই 'সরণ' শব্দের গূঢ় অর্থ।

ত্রিশরণগমনের পরম্পরা ও মানবের কর্তব্য :

মানবের ব্যক্তিগত ও সামূহিক বিকাশে এবং একে স্বাবলম্বী করার প্রয়াসে এ পরম্পরার এক অনুপম অবদান রয়েছে। বহুজনের হিত ও কল্যাণকারী এ মহান পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবহমান রাখা, মানবসমাজের অর্থাৎ আমাদের পরম কর্তব্য।

সব্বে সত্তা হোন্তু সুখীতত্তা।
চিরং তিট্‌ঠতু সদ্ধম্মং।
ভবতু সব্বমঙ্গলং।

সহায়ক-গ্রন্থ-সূচী

১। অঙ্গুত্তর-নিকায় (বঙ্গানুবাদ)
অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
৫০- টি/১ সি, পটারী রোড
কলিকাতা- ৭০০০১৫ (১৯৯৪ ইং)

২। অপদান পালি
Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3
Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

৩। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ)
ঁশান্তপদ মহাস্থবির,
মির্জাপুর গৌতম আশ্রম বিহার,
পো. মির্জাপুর, চট্টগ্রাম,
বাংলাদেশ (১৯৮০ ইং)

৪। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (বঙ্গানুবাদ)
ঁসুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া,
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
৫০- টি/১ সি, পটারী রোড
কলিকাতা- ৭০০০১৫ (১৯৯১ ইং)

৫। কর্মতত্ত্ব

ঁজ্যোতিপাল মহাস্থবির,

বরইগাঁও পালি পরিবেণ

লাকসাম, কুমিল্লা,

বাংলাদেশ (১৯৯২ ইং)

৬। খুদ্দকপাঠ (হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ)

অধ্যাপক ড. ভিক্ষু সত্যপাল,

বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন,

দিল্লী- ১১০০১৯ (১৯৯২ ইং)

৭। খুদ্দক-পাঠ-অট্ঠকথা

Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3

Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

৮। থেরীগাথা

Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3

Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

৯। দীর্ঘনিকায় (বঙ্গানুবাদ)

ঁভিক্ষু শীলভদ্র,

মহাবোধি বুক এজেন্সী,

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কোলকাতা - ৭০০০৭৩ (১৯৯৭ ইং)

১০। ধর্মপদ (বঙ্গানুবাদ)
ঁঁঅধ্যাপক ধর্মাধার মহাস্থবির
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার,
১ নং, বুড়িচষ্ট টেম্পল স্ট্রীট,
কোলকাতা- ৭০০০১২

১১। ধর্মসংহিতা (১ম ও ২য় ভাগ)
ঁঁপ্রজ্ঞালোক মহাস্থবির
পালি গ্রন্থ দীপনী সমিতি
বৈদ্যপাড়া, চট্টগ্রাম,
পূর্ব পাকিস্থান (১৯১৯ ইং)

১২। নেত্তিপ্রকরণ (বঙ্গানুবাদ)
ঁঁশান্তরক্ষিত মহাস্থবির
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ (১৯৮৫ ইং)

১৩। মহাবগ্গ-বিনয়পিটক
Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3
Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

১৪। মধুরত্থবিলাসিনী (বুদ্ধবংস অট্ঠকথা)
Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3
Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

১৫। রসবাহিনী

Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3

Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

১৬। বিমতি-বিনোদনী টীকা

Chaṭṭha Saṅgāyana CD-Rom Version 3

Published by:
Vipassana Research Institute, Dhammagiri,
Igatpuri, Maharashtra - 422403. India

১৭। সার-সংগ্রহ

ধর্মতিলক মহাস্থবির

(রেঙ্গুন বৌদ্ধ প্রেস হতে মুদ্রিত)

Buddha Educational Foundation,

Taipei, Taiwan কতৃক পুনর্মদ্রিত

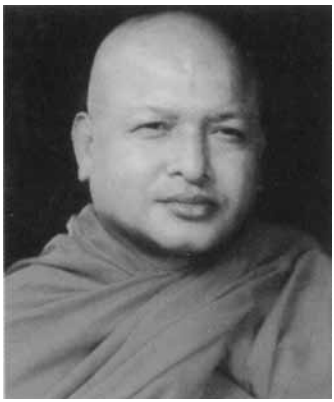

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	ঃ ড. ভিক্ষু সত্যপাল
পিতার নাম	ঃ স্বর্গীয় বিনোদ বিহারী বড়ুয়া
মাতার নাম	ঃ শ্রীমতী যুথিকা রাণী বড়ুয়া
জন্ম স্থান	ঃ হলদিবাড়ী চা বাগান জলপাইগুড়ি (প. ব.)
জন্ম তারিখ	ঃ ০১. ০৩. ১৯৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ত্রিপিটক বিশারদ (স্বর্ণ-পদক)
এম. ফিল, পি. এইচ. ডি., দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা ঃ অধ্যাপনা, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ হতে -)
বর্তমানেঃ বিভাগীয় প্রধান।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ (১) তেলকটাহগাথা (বঙ্গানুবাদ সহ)
(২) খুদ্দক-পাঠ (ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ),
(৩) কচ্চায়ণ-ন্যাস (১ম ভাগ)
(৪) ধম্ম-সংগহ (১ম ভাগ)
(৫) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর,
(৬) বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে
বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ

গ্রন্থ-সম্পাদনা ঃ (১) ভিক্ষু-পরিবাস স্মরণিকা (১৯৮৯)
(ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)।
(২) মৈত্রী স্মরণিকা (১৯৮২)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(৩) ধম্মচক্কং স্মরণিকা (১৯৯৩-২০০৪)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(৪) 'The Buddhist Studies' –Journal
Department of Buddhist Studie
University of Delhi, Delhi -1100(

প্রকাশনার অপেক্ষায়
(গ্রন্থ ও নিবন্ধ) ঃ ২০ টির পাণ্ডুলিপি তৈরী
(বাংলা, ইংরেজী ও পালি ভাষায়)

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：SARANAGRAHANER PARAMPARA,
巴利經典中與月亮有關的典故》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
7,000 copies; April 2013
BA046 - 11146